

বীথিকা

বীথিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সঁতরা

বীথিকা

প্রথম সংস্করণ

শ.দ, ১৩৪২

মূল্য---আড়াই টাকা

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

বিষয়	প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা
অতীতের ছায়া	মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি	১
মাটি	বাঁথারির বেড়া-দেওয়া ভূমি	৫
দুজন	সুখাস্ত-দিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি'	৯
রাত্রিকপিণা	হে রাত্রিকপিণী, আলো জ্বালো একদাব	১২
ধান	কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলিনি তোমাবে	১৫
কৈশোরিকা	হে কৈশোরের প্রিয়া	১৭
সংস্কার	অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে	২২
প্রত্যর্পণ	কবির রচনা তব মন্দিরে জাগে ছন্দেব পদ	২৫
আদিতম	কে আমার ভাসাইন অস্তুরে	২৮
পাঠিকা	বহিছে ছাওয়া উত্তল বেগে	৩১
ছায়াছবি	একটি দিন পড়িছে মনে মোব	৩৫
নিমগ্ন	মনে গড়ে যেন এককালে লিখিতাম	৩৯
ছুটির লেখা	এ লেখা মোব শত দ্বীপের সৈকতভাব	৪৬
নারী-শেষ	দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম	৪৯
বিহ্বলতা	অপরিসীমের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে	৫৩
শ্যামলা	হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ	৫৬
সোডা বার্ড	সেদিন তোমাব মোহ লেগে	৫৮
মৌন	কেন চুপ ক'রে আছি, কেন কথা নাই	৬১
ভুল	মহসা তুমি করেছ ভুল গানে	৬৩
বার্গ-মিলন	বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন	৬৬
অপরাধিনী	অপরাধ যদি ক'রে থাকে	৬৮
বিচ্ছেদ	তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা	৭০
বিদ্রোহী	পরস্পরের অন্য প্রান্তে বসে রিয়া করে রাত্রিদিন	৭২

বিষয়	প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা
আগর রাতি	এল আহ্বান, ওরে তুই স্বরা কর	৭৪
গী তচ্ছবি	তুমি যবে গান করো, অলৌকিক গীতমন্দি ভব	৭৭
ছবি	একলা বসে হেরো তোমার ছবি	৭৯
প্রণতি	প্রণাম আমি পাঠানু গানে	৮১
উদাসীন	তোমারে ডাকিন্ত যবে কুঞ্জবনে	৮৫
দান-মহিমা	নির্ঝরিনী, অকারণ অবারণ স্নেহে	৮৮
ঈশং দয়া	চক্ষে তোমার কিছু বা ককণা শ্রমে	৯০
ক্ষণিক	চৈত্রেয় রাতে যে মাদর্বা মঞ্জরী	৯৩
নৃপকবি	ওরা কি কিছু নোবে	৯৬
মেঘমালা	আসে অবগুণ্ঠিতা প্রাণের অবগ ছকলে	১০০
প্রাণের ডাক	স্বদূর আকাশে ওড়ে চিল	১০২
দেবদাক	দেবদাক, তুমি মহাবর্গী	১০৫
কবি	এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মক না	১০৭
ছন্দোনাধুরী	পায়ণে বাধা কঠোর পথ	১০৯
বিরোধ	এ সংসাবে আছে বহু অপরাধ	১১২
রাতির দান	পথের শেষে নিভিয়া আসে থাকো	১১৫
নদ-পরিচয়	জন্ম মোর বহি' যবে	১১৭
মরণ-মাতা	মরণ-মাতা, এই যে ক'চি প্রাণ	১২০
না না	কুয়াশার জাল	১২২
কাঠবিড়ালী	কাঠবিড়ালীর ছানা ছুটি	১২৫
সাঁওতাল মেয়ে	যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে	১২৮
মিলন-যাত্রা	চন্দন বুপের গন্ধ ঠাকুর-দালান হতে আসে	১৩১
শঙ্করভম	আপন মনে যে কামনার চলোঁড়ি পিছু পিছু	১৩৯
বনস্পতি	কোথা হতে গেলে তুমি অতি পুরাতন	১৪১
শ্রীষণ	বনস্পতি, তুমি যে শ্রীষণ	১৪৪
সন্ন্যাসী	হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর	১৪৮
ছবিণী	হে ছবিণী	১৫০
গোধূলি	প্রাসাদ-ভবনে নিচের তলায়	১৫২

বিষয়	প্রথম পাঠন	পৃষ্ঠা
বাধা	পূর্ণ করি' নারী তা'র জীবনের খালি	১৫৪
তুই সর্গা	তুজন সর্গারে	১৫৬
পথিক	তুমি আছ বসি' তোমার ঘরের দ্বারে	১৫৯
অপ্রকাশ	মুক্ত হও হে সুন্দরী	১৬১
তুর্ভাগিনী	তোমার সম্মুখে এসে তুর্ভাগিনী, দাড়াই যখন	১৬৪
গরবিণী	কে গো তুমি গরবিণী, মানবানে থাকো দূরে দূরে	১৬৭
প্রলয়	আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে দূর ব'লে জানি	১৭০
কলুষিত	শ্যামল প্রাণের উৎস হতে	১৭৩
অভ্যদয়	শত শত লোক চলে	১৭৭
প্রতীক্ষা	আজি বরষণ-মুখরিত শ্রাবণ রাত্ৰি	১৭৯
মুটু	কালুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পরবে পল্লভে	১৮১
বাদল-সন্ধ্যা	জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে	১৮৫
জয়া	রূপহীন, বর্ণহীন, চিবস্তক, নাই শব্দ স্বর,	১৮৭
বাদল-রাত্রি	কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো	১৮৯
'আধুনিক	চিঠি তব পড়িলাম, বণিবার নাই মোর	১৯১
পত্র	অবকাশ মোর তব অন্ন	২০০
অভাগ	মনে হোলো যেন পেরিয়ে এগেয়	২০৩
মাটিতে-আলোতে	আরবার কোলে এল শব্দের	২০৫
মুক্তি	জয় করোছন মন, তাছা বুঝি নাই	২০৯
তুংখী	তুংখী তুমি একা	২১২
মৃগা	আমি এ পথের ধারে	২১৬
স্বপ্ন-অবসান	একদা বসন্তে মোর বনশায়ে যবে	২১৮
নামস্কার	প্রভু, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে	২২১
আশ্বিনে	আকাশ আজিকে নিম্নলতম নীল	২২৭
নিঃশ্ব	কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল	২২৬
দেবতা	দেবতা মানব-লোকে ধরা দিতে চায়	২২৮
শেষ	বহি' ল'য়ে অতীতের সকল বেদনা	২৩০
জাগরণ	দেহে মনে স্পৃহিত যবে করে ভর	২৩২

বীথিকা

অতীতের ছায়া

মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি ;

দিবালোক অবসানে তারালোক জ্বালি’

ধ্যানে যেথা বসেছে সে

রূপহীন দেশে ;

যেথা অন্তসূর্য্য হতে নিয়ে রক্তরাগ

গুহাচিত্রে করিছে সজাগ

তার ভুলি

ত্রিয়মান জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি ;

নির্মীলিত বসন্তের ক্ষান্তগন্ধে যেখানে সে

গাথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে ;

বীথিকা

যেখানে তাহার কণ্ঠহারে

ছুলায়েছে সারে সারে

প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা

মাণিক্যের কণা ।

সেথা বসে আছি কাজ ভুলে'

অস্তাচলমূলে

ছায়া-বীথিকায় ।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়

গোধূলি-ধূসর আবরণে,

অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে

এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,

এ যে চিত্তময় ;

বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে

আপন অন্তর থেকে

অসংখ্য স্বপন,

অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন

বস্তুহীন সৃষ্টি যত,

নিত্যকাল মাঝে তারি ফল শস্য ফলিছে নিয়ত ।

বীথিকা

আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি',

ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি ।

বসে আছি নিনিমেষ চোখে,

অতীতের সেই ধ্যানলোকে,—

নিঃশব্দ ত্রিমির তটে জীবনের বিস্মৃত রাতির ।

হে অতীত,

শান্ত তুমি নির্বাক-বার্তির

অন্ধকারে,

স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন-নিষ্কৃতির পারে ।

শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়

নিভূতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নিঃস্বপ্ন কলায়,

স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা

বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা ;

পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো

উজ্জ্বলি উঠিছে কত,

কত তার নিভাইছ একেবারে

যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে ।

বীথিকা

আজ আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা অগোচর ।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ঐতিহাসে ।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে
তোমারি বিহার-বনে ছায়াবীথিকায় ।
যুচিল কন্মের দায়,
ক্লান্ত হোলো লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ ;
দুঃখে যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি' অপগত
মূর্ত্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে ।
কল-কোলাহল-শান্ত জনশূন্য তোমার প্রাপ্পণে
যেখানে গিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,
কন্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা ॥

মাটি

বাঁথারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেথা করি ঘোরাফেরা

সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা

বর্তমানে ।

মন জানে

এ মাটি আমারি,

যেমন এ শালতরু সারি

বাঁধে নিজ তলবাঁধি শিকড়ের গভীর বিস্তারে

দূর শতাব্দীর অধিকারে ।

হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে বারে শ্রাবণের বারি

সে যেন আমারি,

ভোরে যুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার

যেন সে আমারি আপনার

এ মাটির সামান্যটুকু মাঝে ।

বীথিকা

আমার সকল খেলা সব কাজে

এ ভূমি জড়িত আছে শাস্বতের যেন সে লিখন

হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন

সপ্তমির চিরন্তন দৃষ্টি তলে

ধ্যানে দেখি কালের যাত্রীর দল চলে

যুগে যুগান্তরে ।

এই ভূমিখণ্ড'পরে

তা'রা এল তা'রা গেল কত ।

তা'রাও আমারি মতো

এ মাটি নিয়েছে ঘেরি',

জেনেছিল একান্ত এ তাহাদেরি ।

কেহ আর্য্য কেহ বা অনার্য্য তারা

কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা ।

কেহ হোমায়িতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,

কেহ বা দিয়েছে নরবলি ।

এ মাটিতে একদিন যাহাদের স্রুপ্তচোখে

জাগরণ এনেছিল অরুণ আলোকে

বিলুপ্ত তাদের ভাষা ।

বীথিকা

পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
স্বখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রে মতো প্রতিক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে ।

আসে যায়
ধাতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহান
রাত্রি আর দিন ;
মেঘ রৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে ।
কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়েনি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও হায়া রেখা ।

বীথিকা

হায় আমি,

হায়রে ভূস্বামী,

এখানে তুলিছ বেড়া,— উপাড়িছ তেথা যেই তৃণ

এ মাটিতে সে-ই র'বে লান

পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে । তারপরে ! --

এই ধূলি র'বে পড়ি' আমি-শূন্য চিরকাল তরে ॥

২রা আগষ্ট, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

দুজন

সূর্যাস্ত-দিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাস' ।

দুজনে বসেছে পাশাপাশি ।

সমস্ত শরীরে মনে লঠেতেছে টানি'

আকাশের বাণী ।

চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা

সুন্দর চঞ্চলতা ।

একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,

বক্ষ করেছিল দু'রু দু'রু

অনির্বচনীয় স্রুখে ।

বর্তমান মুহূর্তের দৃষ্টির সম্মুখে

তাদের মিলন-গ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা ।

সে মুহূর্ত পরিপূর্ণ, নাই তাহে বাধা,

দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,

নাইকো সংশয় ।

সে-মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো,

অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত ।

বীথিকা

সে মুহূর্ত উৎসের মতন,

একটি সঙ্কীর্ণ মহাঙ্গণ

উচ্ছলিত দেয় তেলে আপনার সব কিছু দান ।

সে-সম্পদ দেখা দেয় ল'য়ে নৃত্য, ল'য়ে গান,

ল'য়ে সূর্যালোকভরা হাসি,

ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি ।

সে মুহূর্তধারা

ক্রমে আজ হোলো হারা

স্বপ্নের মাঝে ।

সে স্বপ্নের বাজে

মহাসমুদ্রের গাথা ।

সেইখানে আছে পাতা

বিরাতের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে ।

সর্ব দুঃখ সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে ।

সেথা আকাশের পটে

অস্তু উদয়ের শৈলভটে

রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া ।

তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া ।

বীথিকা

সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হয়ে চেয়ে আছে স্বদূর গগনে ।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভ'রে ওঠে জলে ।
ভাবনার স্বগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে ভাষা
করিয়াজে বাসা,
অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে ।
বিশ্বের রহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলনলিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে ॥

২৫ জুলাই, ১৯৩২

শান্তিনিকেতন

রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,

আলো জ্বালো একবার ভালো ক'রে চিনি ।

দিন যার ক্লান্ত হোলো, তারি লাগি কাঁ এনেছ বর,

জানাক্ তা তব য়ুত্ স্বর ।

তোমার নিঃশ্বাসে

ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ আভাসে ।

বুঝিবা বক্ষের কাছে

ঢাকা আছে

রজনীগন্ধার ডালি ।

বুঝিবা এনেছ জ্বালি'

প্রচ্ছন্ন ললাট-নেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা,—

গোপন আলোক তারি গুণে বাক্যহারা,

বীণিকা

পড়েছে তোমার মৌন 'পরে,—

এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে

বিষাদের মতো শান্ত স্থির ।

দিবসে স্তম্ভিত আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর,

নিরন্তর আন্দোলন,

অনুক্ষণ

দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল ।

তুমি এসো অচঞ্চল,

এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,

তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক বহু ক্ষতি লাভ ।

তোমার স্তম্ভিতাখানি

দাও টানি'

অধীর উদ্ভ্রান্ত মনে ।

যে অনাদি নিশ্চিন্তা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে

বহির্দাঁপে উদ্যমের মত্ততার জ্বর

শান্ত করি' করে তারে সখ্যত সুন্দর,

সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে

ক্ষুধ এ জাবনে ।

বাঁথিকা

তব প্রেমে

চিত্তে মোর যাক্ থেমে

অনুহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,

দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ ।

সপ্তমির তপোবনে হোম-ভ্রতান হতে

আনো তব দাঁপ্ত শিখা । তাহারি আলোতে

নির্জন্মের উৎসব আলোক

পূণ্য হবে, সেই ক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক ।

অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র স্নগস্তার

মন্দির করুক আজ রজনীর ত্রিমির মন্দির ॥

ଧ୍ୟାନ

କାଳ ଚଳେ ଆସିଯାଉଛି, କୌଣସି କଥା ବାଲିନି ତୋମାରେ ।

ଶେଷ କ'ରେ ଦିନୁ ଏକେବାରେ

ଆଶା ନୈରାଶ୍ୟର ଧ୍ବନ୍ଦ୍, ଖୁବ୍ କାମନାର

ଦୁଃସହ ଧିକ୍କାର ।

ବିରାହର ବିସମ୍ମ ଆକାଶେ

ସନ୍ନ୍ୟା ହୁଏ ଆସେ ।

ତୋମାରେ ନିରାଧି ଧ୍ୟାନେ ସବ ହତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଯା

ଅନନ୍ତେ ଧରିଯା ।

ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାରୀ,

ନାହିଁ ରାବି ଶଶି ଗ୍ରହତାରୀ,

ବାୟୁ ଧୂଳି ଆଢ଼େ

ଦିଗନ୍ତେ ଏକଟି ରେଖା ଓଁକେ ନାହିଁ ଗାଢ଼େ ।

ନାହିଁକୋ ଜନତା,

ନାହିଁ କାନାକାନି କଥା ।

বীথিকা

নাঈ সময়ের পদধ্বনি

নিরন্ত মূহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি ।

নাঈ আলো, নাঈ অন্ধকার,

আমি নাঈ, গ্রন্থি নাঈ তোমার আমার ।

নাঈ স্রুথ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হোলো সব,

আকাশে নিস্তক এক শান্ত অনুভব ।

তোমাতে সমস্ত লান, হুমি আছ এক।

আমিহীন চিত্তমানে একান্ত তোমারে শুধু দেখা ।

৩ জুলাই

১৯৩২

কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া ।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি' শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইসারাখানি ।
চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে'
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি' ॥

প্রভাত উঠিল ফুটি ;
অরুণ-রাগিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জ কপোত-কপোতা ছুটি ।

বীথিকা

ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে

ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে,

প্রাণ-কল্লোলে মুখর পল্লিবাটে ।

আমি কহিলাম, “তোমাতে আমাতে চলো,

তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো,

নৌকা রয়েছে ঘাটে ॥”

শ্রোতে চলে তরা ভাসি’ ।

জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরা,

দিন রজনীর স্নেহে দুখে গেছে ভরি’,

আছে গানে-গাঁথা কত কাণ্ডা ও হাসি ।

পেলব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে

সে তরণী ‘পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,

পাশাপাশি সেথা খেয়েছি চেউয়ের দোলা ।

কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,

কখনো বা মুখে ছলোছলো দু-নয়ানে

চেয়েছিলে ভাসা-ভোলা ॥

বীথিকা

বাতাস লাগিল পালে ;

ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে,
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে,

মলিন ছায়ার ধূসর গোধূলিকালে ।

আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নৃতন বরণমালা,

নয়নে আনিলে নৃতন চেনার হাসি ।

কোন সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়া নেচে ওঠে বেগে,

আবার চলিছু ভাসি' ॥

ভূমি ভেসে চলো সাথে ।

চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে ;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে

তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে ।

গোপন গভীর রহস্যে অবিরত

ধাতুতে ধাতুতে সুরের ফসল কত

ফলায়ে হুলেছ বিস্মিত মোর গীতে ।

বীথিকা

শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায়ে গলায় তা'রে
সকরণ পূরবীতে ॥

চিনি, নাহি চিনি তবু ।

প্রতি দিবসের সংসারমাঝে ভূমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্ত্যভূমি

তা'র আবরণ খ'সে পড়ে যদি কভু
তখন তোমার মূর্তি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবর্তী,

সকল কালের বিরহের মহাকাশে ।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরণের ইতিহাসে ॥

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে ভূমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চির-মানবার হিয়া

বীথিকা

দেশের কালের অতীত যে মহা দূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,

বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে ।

অসীমের দৃষ্টি ভ'রে এনেছিলে ডালা

পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা

অপূর্ব গৌরবে ॥

৯ মাঘ, ১৩৪০

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে,
মনে হোলো ভূমি,
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি' ।

সাক্ষা আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোকতলে মগ্ন হোলো প্রস্রপ্ত প্রহর
পাড়িব তখন ।

ততক্ষণ পূর্ণ করি' থাক্ মোর নিস্তরক অন্তর
তোমার স্মরণ ॥

কত লোক ভিড় করে জীবনের পাথে
উড়াইয়া ধূলি,
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজ-রথে
আকাশ আকুলি' ।

বীথিকা

প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধৈয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে,
অতিথি আশ্রয় মাগে শান্তিদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন অবসানে,
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূরপানে ॥

মায়ার আবর্তে রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সম্মারে ।

ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে ছাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে ।

উর্দ্ধকণ্ঠে ড্রাক কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে,
প্রত্যাহের জানাশোনা, তবু তারি দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন ।

এই কুস্মটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জাগ দিন ॥

সন্ধার নৈশব্দ্য উঠে সহসা শিহরি' ;
না কহিয়া কথ,

বীথিকা

কখন যে আসো কাছে, দাও ছিন্ন করি'
মোর অস্পন্দিতা ।

তখন বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকাল-দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্র মন্দিরে ;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মালাগাছি
উন্মিত শিরে ॥

তখন বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা

‘উচ্ছৃমিয়া উষ্টি’

রাখিল, সন্তায় মোর রচি’ নিজ সামা,
আপন দেউটি ।

সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী মাঝে

সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে ;

সেই তো বাথানে

অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিষ্ময়ে বিরাজে

দেহে মনে প্রাণে ॥

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪০ ।

প্রত্যর্পণ

কবির রচনা তব মন্দিরে

জ্বালে ছন্দের ধূপ ।

সে মায়া-বাস্পে আকার লভিল

তোমার ভাবের রূপ ।

লভিলে হে নারী তনুর অর্জিত তনু,

পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু,

নানা রশ্মিতে রাঙা ;

পেলে রসধারা অমর বাণীর

অমৃত পাত্র-ভাঙা ॥

কামনা তোমায় ব'হে নিয়ে যায়

কামনার পরপারে ।

স্বদূরে তোমার আসন রচিয়া

ফাঁকি দেয় আপনারে

বীথিকা

ধ্যান-প্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তা'রে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙবে ব'লে ॥

ঐ যে মূর্তি হয়েছে ভূমিত
মৃগ্ন মনের দানে,
আমার প্রাণের নিঃশ্বাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে ;
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে মে,
দাড়াল সমুখে হোম-ভূতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি ।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাছু মন্ত্ৰের ধ্বনি ॥

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে ।

বঁাথিকা

গোপনে জাগালে সুরের বেদনা

বাজে বঁাণা যে গভীরে ।

প্রিয় হাত হতে পরো পুষ্পের হার,

দখি়াতের গলে করো তুমি আরবার

দানের মাল্যদান ।

নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে

করিয়া মূল্যবান ॥



আদিতম

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে,

চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,

বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,

থাকে অশ্রুত সুরে ।

ভাবি বসে গাব আমি তারি গান,

চুপ ক'রে থাকি সারা দিনমান,

অকথিত আবেগের ব্যথা সই ।

মন বলে কথা কৈ কথা কৈ !

চঞ্চল শোণিতে যে

সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতোছে

অর্থ কী জানি তাহা,

আদিতম আদিতমের বাণী তাহা ।

ভেদ করি' বাঞ্জার আলোড়ন

ছেদ করি' বাষ্পের আবরণ

বীথিকা

চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,

স্বর্গের সে বালক

কানে তা'র ব'লে গেছে যে কথাটি

তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি

দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে,

তারি পানে চেয়ে চেয়ে

সেই সুর কানে আসে ।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন

অশাখের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,

তারি সেই বাঙ্কার ধ্বনিহীন—

আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;

মোর শিরাতন্ত্রিতে বাজে তাই ;

সুগভীর চেতনার মাঝে তাই

নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে

অরণ্য-মন্ডর-সঙ্গীতে ।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে

মুখরিত কুসুম ও পল্লবে—

বাঁথিকা

সেই মহাবাগীময় গহন মৌন তলে

নিৰ্বাক্ স্থলে জলে

শুনি আদি ওঙ্কার

শুনি মক গুঞ্জন অগোচর চেতনার ।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে

কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে

তার মাঝে নিই স্থান,

চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান ।

৮ই বৈশাখ, ১৩৪১

পাঠিকা

বহিষ্কৃত হাওয়া উত্তল বেগে

আকাশ ঢাকা সজল মেঘে

ধ্বনিয়া উঠে কেকা ।

করিনি কাজ পারিনি বেশ

গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,

পড়ি তোমারি লেখা

ওগো আমারি কবি,

তোমারে আমি জানিনে কই,

তোমার বাণী ঝাঁকিছে তবু

অলস মনে অজানা তব ছবি ।

বাদলছায়া হায় গো মরি

বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি’,

নয়ন মম করিছে ছলোছলো ।

হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বলে !

বীথিকা

কোথায় কবে আছিলে জাগি',

বিরহ তব কাহার লাগি'

কোন্ মে তব প্রিয়া ।

ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,

জানি তাহারে তুলেছ রচি'

আপন মায়া দিয়া ।

ওগো আমার কবি,

ছন্দ বুকে যতই বাজে

ততই সেই মুরতিমানে

জানি না কেন আমারে আমি লভি ।

নারীহৃদয়-যমুনাতীরে

চিরদিনের সোহাগিনীরে

চিরকালের শুনাও স্তবগান ।

বিনা কারণে ছুলিয়া ওঠে প্রাণ ॥

নাই বা তার শুনিলু নাম

কল্প তাহারে না দেখিলাম

কিসের ক্ষতি তায় ।

বীথিকা

প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায় ।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি',
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি' ।
জেনেছ যারে তাহারো মানো
অজানা যেই সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে
তোমার মাল। এল আমার গলে ।

রষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণ সাঁনো তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি'
গন্ধ তারি স্বপ্ন সম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি ।

বীথিকা

ও গো আমার কবি,
জানো না তুমি য়ুহু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী ।
ঘটেনি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি ॥

বৈশাখ, ১৩৮১

ছায়া ছবি

একটিদিন পাড়িছে মনে মোর ।

উষার নিল মুকুট কাড়ি’

শ্রাবণ ঘন-ঘোর ;

বাদল বেলা বাজায়ে দিল তুরী,

প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ

করিল আলো চুরি ।

সকাল হতে অবিশ্রামে

ধারা-পতনশব্দ নামে,

পর্দা দিল টানি,

সংসারের নানা ধ্বনিরে

করিল একখানি ।

প্রবল বরিষণে

পাংশু হোলো দিকের মুখ,

আকাশ যেন নিরুৎসুক,

বীথিকা

নদীপারের নীলিমা ছায়

পাণ্ডু আবরণে ।

কস্ম-দিন হারাল সীমা,

হারাল পরিমাণ,

বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া

উঠিল গাহি' গুঞ্জরিয়া

বিদ্যাপতি-রচিত সেই

ভরা বাদর গান ।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি'

আপন গন-গড়া,

হঠাৎ মনে পড়িল তবে

এখনি বুঝি সময় হবে

ছাত্রীটির দিতে হবে যে পড়া ।

থামায়ে গান চাহিনু পশ্চাতে ;

ভীরু সে গোয়ে কখন এসে

নীরব পায়ে, ছুয়ার ঘেঁমে

দাঁড়িয়ে আছে খাতা শু বহি হাতে ।

বীথিকা

করিনু পাঠ শুরু ।

কপোল তার ঈষৎ রাঙা,

গলাটি আজ কেমন ভাঙা,

বক্ষ বুঝি করিছে ছুরু ছুরু ।

কেবলি যায় ভুলে’,

অন্যমনে রয়েছে যেন

বইয়ের পাতা খুলে’ ।

কহিনু তারে আজ্কে পড়া থাক্ ।

সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি

চাহিল নির্ঝাক্ ।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,

ভাবিনি ফিরে তারে ।

গিয়েছে তার ছায়ামূরতি

কালের খেয়াপারে ।

স্তব্ধ আজি বাদল বেলা,

নদীতে নাহি ঢেউ,

বীথিকা

অলসমনে বসিয়া আছি

ঘরেতে নেই কেউ ।

হঠাৎ দেখি চিত্রপটে চেয়ে,

সেই বে ভীকু মেয়ে

মনের কোণে কখন গেছে অঁকি'

অবসিত অশ্রুভরা

ডাগর ছুটি অঁখি ॥

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪২

চন্দননগর

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে যেন এককালে লিখিতাম

চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে ।

একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম,—

থাক্ সে কথায়,—লিখি বিনা নাম দিয়ে ।

তুমি দাবী করো কবিতা আমার কাছে,

মিল মিলাইয়া দুৰূহ ছন্দে লেখা,

আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে

নম্র চোখের কম্প কাজল রেখা ।

সহজ ভাষায় কথাটা বলা-ই শ্রেয়,—

যে কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,—

সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া য়েয়ো,

বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে ।

গৌরবরণ তোমার চরণমূলে

ফল্‌সাবরণ সাড়ীটি ঘেরিবে ভাণো ;

বীথিকা

বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,

কপোল প্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো ।

একগুছি চুল বায়ু উচ্ছ্বাসে কাঁপা

ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,

ডাহিন অলকে একটি দোলন-চাঁপা

ছলিয়া উঠুক গ্রীবা-ভঙ্গীর সনে ।

বৈকালে গাঁথা যুথী-মুকুলের মালা

কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁতো ;

দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা

স্বপ্নসংবাদ মেলিবে হৃদয়মানো ।

এই স্বপ্নযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—

আমারি দেওয়া সে ছোট চুনার তুল

—রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা—

কতদিন সেটা পরিতে করেছ তুল ।

আরেকটা কথা ব'লে রাখি, এইখানে

কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,

স্বর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে,

তুচ্ছ শোনাবে তবু সে তুচ্ছ কই ।

বৌথিকা

একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,

সোনার বাঁণাও নহে আয়ত্তগত ।

বেতের ডালায় রেশমি রুমাল-টানা

অরুণবরণ আম এনো গোটাকত ।

গগজাতীয় ভোজ্য ও কিছু দিয়ে,

পড়ে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায় ।

তা হোক, তবুও লেখকের তা'রা প্রিয়,

জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায় ।

ঐ দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত

মুখেতে জোগায় স্থলতার জয়ভামা,

জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত

জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা ।

তথাপি পক্ষ বলিতে নাহি তো দোষ

যে কথা কবির গভীর মনের কথা---

উদর-বিভাগে দৈহিক পরিতোষ,

সঙ্গী জোড়ায় মানসিক মধুরতা ।

শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া,

মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও

বীথিকা

যবে দেখা দেয় সেবা-মাধুর্য্যে ছোঁওয়া

তখন সে হয় কী অনির্বচনীয় ।

বুঝি অনুমানে চোখে কোতুক বলে,

ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা

এ সমস্তই কবিতার কোশলে

মৃদুসঙ্কেতে মোটা ফরমাস করা ।

আচ্ছা, না হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো,

বরদানে, দেবি, না হয় হইবে বাম,

খালি হাতে যদি আসো, তবে তাই এসো,

সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম ।

সেই কথা ভালো, ভুমি চলে এসো একা

বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে,

স্কন্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,

সন্ধ্যাতারাটি শিরীষ ডালের কাঁকে ।

তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে

ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার ঘূর্ণীর মালা,

ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে

তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা ।

বাথিকা

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে

লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,

মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে

কোন দূর যুগে তারিখ ইহার কবে ।

মনে ছবি আসে,—বিাকর্মিক বেলা হোলো,

বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;

কচি মুখখানি, বয়স তখন মোলো,

তনু দেহখানি ঘরিয়াকে ডুরে মাড়ি ।

কুমুম-ফোঁটা ভুরু-সঙ্গমে কিবা,

শ্বেতকরবার গুচ্ছ কর্ণমূলে,

পিচন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা

লোভন হয়েছে রেশম-চিকন চূলে ।

তাত্র থালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে

সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি',

ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,

কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি ?

আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি

গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,

বীথিকা

দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়া-ছবি,

শব্দটি নেই,—ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করে ।

ঐ তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,

দেবরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি ;

কতদিন হোলো গিয়েছ, ভাবিব না তা',

শুধু রচি ব'সে নিমন্ত্রণের চিঠি ।

মনে আসে, তুমি পূব জানালার ধারে

পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে,

উৎসুক চোখে বুঝি আশা করো কারে,

আল্গা আঁচল মাটিতে পড়েছে থ'সে ।

অন্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,

বাকি অন্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;

পাঁচিলের গায়ে চাঁনের টবের থেকে

চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে ছাওয়া ।

এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,

আপাতত এটা দেবরাজে দিলেম রেখে ;

পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়

চোখ টিপে' ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে

বীথিকা

আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ে পাত্তি',
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন্,
আনিয়ে মধুর স্বপ্ন-সঘন রাতি,
আনিয়ে গভীর আলস্রঘন দিন ।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা,
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরীধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা ।

২৪ জুন, ১৯৩৫

চন্দননগর

ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে ।
উদ্দেশহীন জোয়ার ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা-খুসি-তাই ভাসিয়ে আনে ।
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন-কাটাবার ;
আট-পছরে কাপড়টা তার ধূলায় দাগী,
বড়ে ঘরের নেমন্ত্নে নয় পাঠাবার ।
বয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি
ভাবনাগুলো উড়ে উড়ে আপনা-ভোলা ।
অযতনের সঙ্গী তাহার ধূলোমাটি,
বাহির পানে পথের দিকে ছুয়ার খোলা ।
আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,
ললাটে তার রক্ষ কেশের অবহেলা ।

বাথিকা

নাইক খেয়াল কখন সকাল পেরোয় ছুপর,

রেশমি ডানায় যায় চলে তার হাল্কা বেলা ।

চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,

দ্বারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পিছু ।

সুধাও যদি প্রশ্ন কোনো, তাকিয়ে র'বে

বোকার মতন, --- বলার কথা নেই যে কিছু ।

ধূলায় লোটে রাঙা পাড়ের আঁচলখানা,

দুই চোখে তার নাল আকাশের স্তব্ধ ছুটি,

কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,

মুখের 'পরে কে রাখে তার নয়ন দুটি ।

মস্মরিত শ্যামল বনের কাপন থেকে

চম্কে নামে আলোর কণা আল্গা চুলে ;

তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলছে বেঁকে,

দোয়েল-ডাকা কাউয়ের শাখা উঠছে ছলে' ।

সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কার্মিনা ফুল

আনন্দিত অপব্যায়ে পাপড়ি ছড়ায় ;

বেড়ার ধারে বেগ্নি-গুচ্ছে ফুল্ল জারুল

দখিন হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায় ।

বীথিকা

তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
তুলসি-ঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে ।
খাম্-খেয়ালি একটা ভ্রমর আশে পাশে
গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্ বনান্তরে ।
পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
শেখার মতো কোনো কিছুই হয়নি শেখা,
আলো ছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা ।
সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে,
শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে,
পাতার শব্দ জলের শব্দ পাখীর ডাকে
প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান্ সুরে ।
সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা,
বিশ্বমাঝে ধূলার পরে অসজ্জিত,
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত ॥

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

চন্দননগর

নাট্যশেষ

(১)

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম ;—
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে । জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে । আজ বুঝিয়াছি পশ্চিম আলোতে
ছায়া ওরা । নটরূপে এসেছে নেপথ্যালোক হতে
দেহ ছদ্মসাজে ; সংসারের ছায়া-নাট্য অন্তহীন
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল ; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গী নানা ভাবে । শেষে অভিনয় হোলে সারা,
দেহ-বেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হোলো হারা ।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্ব-মহাকবি কাছে

বৌথিকা

প্রকাশিত । নট-নটী রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য ব'লে জেনেছিল প্রত্যাহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থান পতন বেদনার । অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল, নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা,
স্নান হোলো অঙ্গরাগ, বিচিত্র চাকল্য গেল থেমে,
যে নিস্তুর অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে
স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
দুঃখস্বথ-ভঙ্গী অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জা ভয়ের ব্যঞ্জনা । যুদ্ধে উদ্ধারিয়া মাতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিত বসিল তার চিতা ;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ, শুধু তারে কবির নাটক
কাব্য-ডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান ।

(২)

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আমাড়ে ধূসর নদীজলে

বাঁথিকা

গগন হোলো । ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে । একা বসে দেখিতেছি মনে মনে মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায় । সেদিনের সৃষ্টিভাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কাঁ প্রত্যাশার অর্কণম প্রথম উন্মেষ ;
সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায় । জানা-না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু ।
অকস্মাৎ পথমারো কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেয়েই ; পরিব্যাপ্ত হোলো জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে । ছায়ায় আলোয় বোনা
আতপ্ত ফাল্গুন দিনে মস্মারিত চাকুল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
বনক চাঁপার আভা । গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে । দুজনে করিল আসা যাওয়া
অজানা অধীরতায় ।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি'

যে রাত্রি হয় না কভু ভোর । অদৃষ্টির সে অঞ্জলি

বীথিকা

এনেছিল স্খা, নিল ফিরে । সেই যুগ হোলো গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর স্খগন্ধের মতো ।
তখন সেদিন ছিল সব চেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে । সেই স্খ দুঃখ তা'র
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সৌমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুম্বকির কাজে, বিঁধে আলোকের সূচি ;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি' ।
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তা'রা গানের কথায় ।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপাটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে ॥

বিস্ময়

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে
পল্লবের সমারোহে ।

মনে পড়ে সেই আর কবে
দেখেছিলু শুধু ক্ষণকাল ।

থর সূর্য্যকর-তাপে
নিষ্ঠুর বৈশাখ বেলা ধরণীর রুদ্র অভিশাপে
বন্দী করেছিল তুমুজালে ।

শুষ্কতরু,

শ্মশান,

অবসন্ন পিককণ্ঠ,

শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন ।

বীথিকা

সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার,
জ্বালাময় আঁখি,

বর্ণচ্ছটাইন বেশ,

নির্বিষ্কার

মুখচ্ছবি ।

বিরল-পল্লব স্তব্ধ বনবীথি 'পরে
নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্মরে
করেছি বন্দনা ।

জানি সে না-শোনা সুর গেছে ভেসে
শূন্যতলে ।

সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে
একদা অর্পিয়াছিছু স্পর্শবাণী, সত্য নমস্কার,
অসঙ্কোচে পূজা অর্ঘ্য,

সে-ই জানি গৌরব আমার ।

আজ ক্ষুদ্র ফাল্গুনের কলস্বরে মত্ততা হিল্লোলে
মন্দির আকাশ ।

আজি মোর এ অশান্ত চিত্ত দোলে
উদ্ভ্রান্ত পবন বেগে ।

বীথিকা

আজ তারে যে বিহ্বল চোখে
হেরিলাম, সে যে হয় পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে
মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা ।

পাই নাই শান্ত অবসর
চিনিবারে চেনাবারে ।

কোনো কথা বলা হোলো না যে
মোহমুক্ত ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে ॥

শ্যামলা

হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চূপ,—

মুখে তব স্তম্ভের রূপ

পড়িয়াছে ধরা

সন্ধ্যার আকাশসম সকল চঞ্চল চিন্তাহরা ।

আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার

সমুদ্রের পরপার,

গোধূলি প্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি ;

অধরে তোমার বাঁগাপাণি

রেখে দিয়ে বাঁগা তাঁর

নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ বাঙ্কার ।

অগীত সে সুর

মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে স্তম্ভর

হিমঘন তপস্রায় স্তম্ভলীন

নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন ।

বীথিকা

জলভারনত মেঘে

তমাল বনের 'পরে আছে লেগে

সকরণ ছায়া স্তম্ভীর,—

তোমার ললাট 'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির ।

ক্লান্তঅশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে

স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে

শান্তধারা

কলশব্দহারা

তাহারি বিষাদ কেন

অতল গান্ধীর্য্য ল'য়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন ।

শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে

আঁখি ডুবে যায় একেবারে—

ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,

দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর

বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী

এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্ঝাক মুখখানি ॥

১৩ শ্রাবণ, ১৩৩৯ ।

পোড়োবাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে ;
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে
তুমি আছ এ ভুবনে ।
পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশাখের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব
তোমার শয়ন-ঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি'
নাগকেশরের পুষ্প-ভার
অলক্ষ্য তোমার ।
প্রতিদিন দেখা হোত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে ।

বাঁথিকা

সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো

আলোরে করিত আরো আলো ।

সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ

নন্দনের আনিত নিঃশ্বাস ।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি' নহে তা'র মাপ,

তা'রে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ ।

নিশ্চয় ভাগ্যের হাতে লেখা

বঞ্চনার কালো কালো রেখা

বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে ।

আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে

সেদিনের কথাগুলি

দুর্লক্ষণ বাহুড়ের মতো আছে ঝুলি' ।

আজ যদি তুমি এসো কোথা তব ঠাঁই,

সে তুমি তো নাই ।

আজিকার দিন

তোমাতে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন ।

বীথিকা

তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়ো বাড়ি,

লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি' ;

ভূতে-পাওয়া ঘর,

ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর ।

আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,

তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ

বিনাশের গন্ধ ভুঁটে, দুর্গহের শাপ,

দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ ॥

৩ আগষ্ট, ১৯৩২

মৌন

কেন চুপ ক'রে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইচ্ছ তাই।

কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,

বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরে যায় হেসে।

মৌনের বিপুল শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়

হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আস্থানে, রবাহৃত

প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।

স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।

বাথিকা

ক্ষুরক বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে

দৈববাণী নামে সেই অবকাশে ।

নীরব আমার পূজা তাই,

স্তবগান নাই ;

আদ্র স্বরে উদ্ধাপানে চেয়ে নাহি ডাকে,

স্তবক হয়ে থাকে ।

হিমাদ্রিশিখরে নিত্য নীরবতা তার

ব্যাপ্ত করি' রহে চারিধার,

নিলিপ্ত সে স্তূরতা বাক্যহীন বিশাল আস্থান

আকাশে আকাশে দেয় টান ;

মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে

অবারিত অভিষেকে

অজস্র সহস্রধারে

পুণ্য করে তা'রে ।

না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন

সার্থক শান্তিতে যাক্ দিন ॥

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে
বেধেছে লয় তানে,
স্থলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা
সরমে তাই মলিন মুখ নত
দাঁড়ালে খতমতো,
তাপিত দুটি কপোল হোলো রাঙা ।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো
শুধালে তবু কথা কিছু না বলো,
অধর থরো থরো
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধরো ॥

অবমানিতা জানো না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ক্রটির মাঝখানে ।

বীথিকা

নিখুঁৎ শোভা নিরতিশয় তেজে

অপরাজেয় সে যে

পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে ।

একটুখানি দোমের ফাঁক দিয়ে

হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ প্রিয়ে

করণ পরিচয়,

শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয় ।

ভূমিত হয়ে ঐটুকুরই লাগি’

আছিল মন জাগি’

বুঝিতে তাহা পারিনি এতদিন ।

গৌরবের গিরিশিখর ’পরে

ছিলে যে সমাদরে

ভূমার সম শুভ্র স্বকঠিন ।

নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা

ধূসর স্নান আপন-মান-হারা

আমারো ক্ষমা চাহি’

তখনি জানি আমারি ভূমি নাহি গো দ্বিধা নাহি ।

বীথিকা

এখন আমি পেয়েছি অধিকার

তোমার বেদনার

অংশ নিতে আমার বেদনায়।

আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে’

জীবনে মোর উঠিল ফুটে’

সরম তব পরম করুণায়।

অকুণ্ঠিত দিনের আলো

টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো ;

আমার সাধনাতে

এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে

৬ বৈশাখ, ১৩৪১

ব্যর্থ মিলন

বুঝিলাম এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি' ।

ক্ষুব্ধ মন

যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে
তোমাতে হারায় হতাশ্বাস ।

তব হাতে

দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল পরশে
করিছে কৃপণ কৃপা । কর্তব্যের বশে
যে দান করিলে, তার মূল্য অপহরি'
লুকায়ে রাখিলে কোথা,

আমি খুঁজে মরি

পাইনে নাগাল । শরতের মেঘ তুমি
ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও,

মরুভূমি

শূন্য পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি' করে হাহাকার ।

বীথিকা

ভয় করিয়ো না মোরে ।

এ করুণা-কণা

রেখো মনে—ভুল ক'রে মনে করিয়ো না

দস্যু আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর ।

জেনো মোরে

প্রেমের তাপস ।

সুকঠোর ব্রত ধ'রে

করিব সাধনা,

আশাহীন ক্ষোভহীন

বহুতপ্ত ধ্যানাসনে রবো রাত্রিদিন ।

ছাড়িয়া দিলাম হাত ।

যদি কভু হয়

তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয় ।

না-ও যদি ঘটে, তবে আশা-চঞ্চলতা

দাহিয়া হইবে শান্ত । সেও সফলতা ।

অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাকে।

কেন চাকে।

মিথ্যা মোর কাছে,

শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে—

যে হাতে তোমার কণ্ঠে পরায়েছি বরণের হার

শাস্তি এ আমার ।

ভাগ্যেরে করেছি জয়

এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয় ।

আলস্যে কি ভেবেছিছু তাই

সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই ;

রুক্ষ ভাগ্য ভেঙে দিল অহঙ্কার ।

যা ঘটিল তাই আমি করিছু স্বীকার ।

ক্ষমা করে। মোরে ।

আপনারে রেখেছিছু কারাগার ক'রে

তোমারে ঘিরিয়া,

পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া।

দিনে রাতে ।

বীথিকা

কখনো অজ্ঞাতে

যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার ।

বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার

সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে ।

বসেছি আসন পেতে

যেখানে স্থানের টানাটানি ।

হায় জানি

কী ব্যথা কঠোর ।

এ প্রেমের কাণ্ডাগারে মোর

যন্ত্রণায় জাগি’

স্বপ্ন কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি’

দোষ দিব কারে ।

শাস্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধদ্বারে ।

সে শাস্তির হোক অবসান ।

আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিপির বিধান ॥

বিচ্ছেদ

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ;

হোলো না সহজ পথ বাঁধা

স্বপ্নের গহনে ।

মনে মনে

ডাক দাও পরস্পারে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;

তবু ঘটিল না কোন্ সামান্য ব্যাঘাতে

মুখোমুখী দেখা ।

দুজনে রহিলে একা

কাছে কাছে থেকে ;

ভুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দৌঁহারে রহিল যাত্রা ঢেকে

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে

বায়ুশ্রোতে

ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস ;

চৈত্রের আকাশ

রৌদ্রে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান ;

আসে দোয়েলের গান,

দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা ।

বীথিকা

উভয়ের আনাগোনা

আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে

চকিত নয়নে ।

পদধ্বনি শোনা যায়

শুষ্কপত্র-পরিকীর্ণ বন-বীথিকায় ।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ

কখন দৌহার মারো একজন

উঠিবে সাহস ক'রে

বলিবে “যে মায়া ডোরে

বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন

ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন ।

লও বক্ষে ছুবাছ বাড়ায়ে,

সন্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে” ॥

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

বিদ্রোহী

পৰ্ব্বতের অন্য প্রান্তে বার্মিয়া বারে রাত্রিদিন
নিৰ্ম্মিণী ;

এ মরুপ্রান্তের তৃষণা হোলো শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে ।

শুধু ওই ধ্বনি

তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে ।

কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার

মস্তকের শিরায় মোর তাঁত্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যশ্রোত ।

ওই ধ্বনি আমার স্বপন

চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায় ।

মৃচের মতন

ভূলিব না তাহে কভু ।

বীথিকা

জানিব মানিব নিঃসংশয়

দুর্লভেরে মিলিবে না ;

করিব কঠোর বীর্যে জয়

ব্যর্থ দুরাশারে মোর ।

চিরজন্ম দিব অভিশাপ

দয়ারিক্ত দুর্গমেরে ।

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ ;

দুঃসহ দাহনে তা'র দীপ্ত করি' হানিব বিদ্রোহ

অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে ।

পুনিব না ভিক্ষুকের মোহ ॥

৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

চন্দননগর

আসন্ন রাতি

এল আস্থান, গুরে তুই ত্বরা কর্ !
শীতের সন্ধ্যা সাজায় বাসর ঘর ।
কালপুরুষের বিপুল মহাস্নান
বিছালো আলিম্পন,
অন্তরে তোর আসন্ন রাতি
জাগায় শঙ্খরব,
অস্তশৈল-পাদমূলে তাঁর
প্রসারিল অনুভব ॥

বিরহ-শয়ন বিছানো হেথায়
কে যেন আসিল চোখে দেখা নাহি যায় ।
অতীতদিনের বনের স্মরণ আনে
ত্রিয়মাণ য়ুছ সৌরভটুকু প্রাণে ।

বীথিকা

গাঁথা হয়েছিল যে মাধবী হার
মধু পূর্ণিমা রাতে
কণ্ঠ জড়াল পরশবিহীন
নির্ঝরক বেদনাতে ॥

মিলনদিনের প্রদীপের মালা

পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা',
আজি আঁধারের অতল গহনে হারা
স্বপ্ন রচিছে তা'রা ।

ফাল্গুন-বন-মর্ম্মর সনে
মিলিত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তব্ধ বাণী ॥

কী নামে ডাকিব কোন কথা কব,
হে বধু, ধৈর্য্যে আঁকিব কী ছবি তব ?
চিরজীবনের পুঞ্জিত স্মৃতি
কেন আজি উৎসুক ?

বীথিকা

উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে

আমার বক্ষোমাবে

শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে

সাহানায় বাঁশি বাজে ॥

আজ বুঝি তোর ঘরে ওরে মন

গত বসন্ত রজনীর আগমন ।

বিপরীত পথে উত্তর বায়ু বেয়ে

এল সে তোমারে চেয়ে ।

অবগুণ্ঠিত নিরলঙ্কার

তাহার মূর্তিখানি

হৃদয়ে ছোঁ ওয়ালো শেষ পরশের

ভুষার-শীতল পারি

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান করো, অলৌকিক গীতমূর্ত্তি তব
ছাড়ি' তব অঙ্গসামা আগার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী,—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতি-বিজড়িত বেণী,
চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধা পিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে' ।
অনার্দীবীণায় বাজে যে-রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি' উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায়, তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্ম মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসি ক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহ বন্ধনের

বীথিকা

পাশ দেয় মুক্ত করি', বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে, যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি,
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি ॥

৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

চন্দননগর

ছবি

একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রং দিয়া ।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভা
মোমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া ॥
সমুখপানে বালুতটের তলে
শীর্ণনদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া ॥

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে ।
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি'
রং ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে ।

বীথিকা

তপ্ত হাওয়ায় শিথিল মঞ্জরী
গোলক-টাঁপা একটি দুটি করি'
পায়ের কাছে পড়ছে বরি' বরি'
তোমাতে নন্দিয়া ॥

ঘাটের ধারে কম্পিত বাঁউশাখে
দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি' ।
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুরবর্ণ অঞ্জলি ।
বনের পথে কে যায় চলি' দূরে
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে' হাওয়ায় ঘুরে' ঘুরে'
ফিরিছে ক্রন্দিয়া ॥

১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রগতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে

উদয়-গিরিশিখর পানে

অস্তমহাসাগর তট হতে—

নবজীবন যাত্রাকালে

সেখান হতে লেগেছে ভালে

আশিসখানি অরুণ আলোশ্রোতে ।

প্রথম সেই প্রভাত দিনে

পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,

কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি' ?

চিররাতের তোরণে থেকে

বিদায়বাণী গেলেম রেখে

নানা রঙের বাষ্প-লিপি ভরি' ।

বীথিকা

বেসেছি ভালো এই ধরারে

মুগ্ধ চোখে দেখেছি তা'রে

ফুলের দিনে দিয়েছি রচি' গান,

সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,

সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,

আর যা আছে হৃউক অবসান ।

রোদের বেলা ছায়ার বেলা

করেছি স্মখদুখের খেলা

সে খেলাঘর মিলাবে মায়া সম ;

অনেক তৃষা অনেক স্মুধা,

তাহারি মাঝে পেয়েছি স্মুধা,

উদয়গিরি প্রণাম লহ মম ।

বরষ আসে বরষ শেষে

প্রবাহে তারি যায়রে ভেসে

বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে ।

বীথিকা

বারে বারেই ঋতুর ডালি,

পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি

মমতাহীন সৃষ্টিলীলা ভরে ।

এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা

উঠেছে ভরি' কানায় কানা

রঙীন রসধারায় অনুপম ।

একটুকুও দয়া না-মানি'

ফেলায়ে দেবে জানি তা জানি,—

উদয়গিরি তবুও নমোনম ।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,

কখনো নানা সুরের ভিড়ে

রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা ।

ফাল্গুনের আমন্ত্রণে

জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে

পড়েছে বারি' চৈত্রবায়ে কাঁপা ।

বীথিকা

অনেক দিনে অনেক দিয়ে

ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে

ভাঙন হোলো চরম প্রিয়তম,

সাজাতে পূজা করিনি ক্রটি,

ব্যর্থ হোলে নিলেম ছুটি,

উদয়গিরি প্রণাম লহ মম ॥

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কাঁ লাগি' ছিলে অন্য মনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল
একদিন শাখা ভরি' এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি' গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতাপানে আঁখি অন্ধ ছিল ॥

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরণ ফল খসিয়া পড়ে ;
কহিনু, “ধূলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ,”
হায়রে তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল ॥

বাথিকা

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা
আঁধারে ছুয়ারে তব বাজানু বীণা ।
তারার আলোক সাথে মিলি' মোর চিত্ত
ঝঙ্কত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিঃস্পন্দ ছিল ॥

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখী
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি' ।
প্রহর অতীত হোলো, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্জে চন্দ্র ছিল ॥

কে বোঝে কাহার মন ! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া ।
আশা ছিল কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত,
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল ॥

বীথিকা

ঊষার চরণতলে মলিন শশি

রজনীর হার হতে পড়িল খসি' ।

বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,

নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,

স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল ॥

৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১

শান্তিনিকেতন

দান-মহিমা

নির্বাণিণী অকারণ অবারণ স্মখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে,—

নিত্য অফুরান

আপনারে করে দান ।

সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল,

বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তরু নিস্তল ।

চির অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে,

ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে

অনিঃশেষ রস করে পান,

অজস্র পল্লবে তা'র করে স্তব গান ।

তোমারে তেমনি দেখি নিবিকল

অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল ।

তুমি করো বর-দান দেবী-সম ধীর আবির্ভাবে

নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গস্তীর প্রভাবে ।

বীথিকা

তোমার সামীপ্য, সেই,
নিত্য চারিদিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায় ।

তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা, চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে ।
ঐশ্বর্য্য রহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একইকালে ধন সেই দান সেই, ভেদ নেই মাঝে ॥

৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩২

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কোঁতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর ।
আলো আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশা নিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর ॥

নিশ্চয়ম হোতে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক স্মৃধা ।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি'
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে স্মৃধা ॥

বীথিকা

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুন রাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি',
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণ বায়ু তরে ।
তা'র সম্পদ সারা অরণ্য ভরি',
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুপ্তিত ধূলি 'পরে ॥

উত্তর বায়ু আমি ভিক্ষুক সম
হিম-নিঃশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি' ।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
রূপণ দয়ায় কচিৎ একটি ফুটে
অবগুপ্তিত অকাল পুষ্প-কলি ॥

যত মনে ভাবি রাখি তা'রে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়-প্রবাহে বা'রে-পড়া যত পাতা ।

বীথিকা

বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে ।

বরণ-মাল্য হয় না তাহাতে গাঁথা ॥

জামুয়ারী

১৯৩৪

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবী মঞ্জরী
ঝরে গেল, তা'রে কেন লও সাজি ভরি' ?
সে শুধিছে তার ধূলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা ।
মরু-পথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পারো,
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো ?
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয় ।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হোতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো ।
হায় গো, ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,

বঁাথিকা

বক্ষে তাহারে সঞ্চয় ক'রে রাখি,
ধূলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি ।
নিমেমে নিমেমে ফুরায় বাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ ?
যাহা ভুলিবার তাহা নহে ভুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার !
প্রতিপলকের নানা দেনা-পাওনায়
চলতি মেঘের রঙ্ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে ; চল-তরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পের মায়া,—নির্ম্মম তার ভুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি' ।
বিস্মৃতি-পটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি ।
হাসি-কান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা ।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই ।

বীথিকা

মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়া তা'রে অকাতরে অনায়াসে ।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তা'র ভার,
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তা'র ।
স্বর্গ হইতে যে স্রুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে ।
তুমি ভরি' লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি' ॥

রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে,
যাহারা আনাগোনার পথে
ফেরে কত কী খোঁজে ?
হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে,
জীবন-প্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নহে ।
ওরা তো কথা কহে,
সে সব কথা মূল্যবান জানি,
তবু সে নহে বাণী ॥

রাতের পরে কেটেছে দুখ-রাত
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।

বীথিকা

সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নিশ্চয়,
বহ্নিতুলি সম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোওয়ানো দীক্ষা তারি নিষ্ঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে,
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে ?

হায় রে রূপকার,
না হয় কারো করো নি উপকার,
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান ।
পাঁজর-ভাঙা কঠিন বেদনার
অংশ নেবে শক্তি হেন বাসনা হেন কার ?
বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি',
জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা,
সে প্রেম তা'রা কেমনে দিবে আনি'
যে প্রেম সব-হারা,

বীথিকা

করণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ক্রটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে ।
কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
মর্মমাঝে করে নি আঁগি পাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়,
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
করে না ক্ষমা কভু,
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু ॥

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার ;
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবী ফলের অধিকার ।

বীথিকা

জানিয়ে মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়ামাঝে,
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তঁাহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে' দেখা ॥

মেঘমালা

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে

আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায় ;

তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,

গিরিরাজ কঠোরতা যায় ভুলি',

চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় ভুলি'

সজল তরুণ মেঘমালা ।

কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা ।

অচলে চঞ্চলে লীলা,

স্বকঠিন শিলা

মত্ত হয় রসে ।

উদার দাক্ষিণ্য তা'র বিগলিত নিঝরে বরষে,

গায় কলোচ্ছল গান ।

সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান

এ মেঘমালারি ।

বীথিকা

এ বর্ষণ তারি

পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে

নৃত্য-বন্যাবেগে

বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে,

তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।

নিশ্বাসের তপস্যা টুটিয়া

চলিল ছুটিয়া

দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,

জয়ের উৎসাহ ;

শ্যামলের মঙ্গল উৎসবে

আকাশে বাজিল বাণী অনাহত রবে।

লঘু স্নকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে

রুদ্ধ সন্ন্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে

দিল ছাড়া ; সৌন্দর্যের বীর্যবলে

স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি' দিল ধরাতলে ॥

৫ আগষ্ট, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

প্রাণের ডাক

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,

উড়ে ফেরে কাক,

বারে বারে ভোরের কোকিল

ঘন দেয় ডাক ।

জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,

বক উড়ে যায় তারি ধারে,

ডাকাডাকি করে শালিখেরা ।

প্রয়োজন থাক্ না-ই থাক্

যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,

যেথা সেথা করে চলাফেরা ।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা

আপনারে নিয়ে ।

অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা

উঠিছে ফেনিয়ে ।

বীথিকা

জোয়ার লেগেছে জাগরণে,

কলোল্লাস তাই অকারণে,

মুখরতা তাই দিকে দিকে ।

ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়

কী মদিরা গোপনে মাতায়,

অধীরা করেছে ধরণীকে ।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো

তুমি আপনারে,

ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখো

কেন চারিধারে ?

প্রাণের উল্লাস অহেতুক

রক্তে তব হোক না উৎসুক,

খুলে রাখো অনিমেষ চোখ,

ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে'

যাহা পাও টেনে লও তীরে,

ঝিনুক শামুক মা-ই হোক ।

বাথিকা

হয় তো বা কোনো কাজ নাই

ওঠো তবু ওঠো,

রথা হোক তবুও রথাই

পথপানে ছোটো ।

মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে’

প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,

কেবল পরশ তার লহ,

আজি এই চৈত্রের প্রভাতে

আছ তুমি সকলের সাথে

এ কথাটি মনে প্রাণে কহ ॥

৭ এপ্রেল, ১৯৩৪

জোড়াসাঁকো

দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাগী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি'---
যে প্রাণ নিস্তরু ছিল মরু-দুর্গতলে
প্রান্তর-শৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগযুগান্তরে ।
যে প্রথম যুগে তুমি দেখা দিলে নির্জন প্রান্তরে,
রুদ্ধ অগ্নি-তেজের উচ্ছ্বাস
উদঘাটন করি' দিল ভবিষ্যের ইতিহাস,
জীবের কঠিন স্বন্দ্র অন্তহীন,
দুঃখে সুখে যুদ্ধ রাত্রিদিন,
জ্বলে ক্ষোভ-হতাশন
অন্তর-বিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন
শিখার রসনা
অশান্ত বাসনা ।
ম্লিঙ্ক স্তরু রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চূপে চূপে

বীথিকা

ধরণীর রঙ্গভূমে রচি' দিলে কী ভূমিকা,
তারি মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা
মহানাট্য জীবন মৃত্যুর,
কঠিন নিষ্ঠুর
দুর্গম পথের দুঃসাহস ।

যে পতাকা উর্দ্ধপানে তুলেছিলে নিরলস
বলো কে জানিত তাহা নিরন্তর যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি দিয়ে ঢাকা ।

কে জানিত আজ আমি এ জন্মের জীবন মন্দিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি' চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে,
সে যুগের বসন্ত বায়ুতে

প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্ম্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি'
ভূমি বনস্পতি,
মোর জ্যোতি-বন্দনায় জন্মপূর্ব্ব প্রথম প্রণতি ॥

২৬ চৈত্র, ১৩৩৯

কবি

এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মরু না,
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা ।
মাঘ মাসে শুরু হোলো অনুকূল কর-দান,
অন্তরে কোন্ মায়া-মন্তরে বর-দান ।
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা ॥

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে ।
ঐ দেখো অশোকের শ্যাম-ঘন আঙিনায়
কুপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায় ।
সৌরভ-গরবিণী তারামণি লতা সে,
আমার ললাট 'পরে কেন অবনতা সে ॥

বাণিকা

চম্পক তরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে !
মধুকর-বন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহ কার ।
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে ॥

পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিক-বনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভণিতা ।
বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথা সেগা হায়,
আমি না রহিলে বলো কথা দেবে কে তাহায় ।
পুষ্পচয়িনী বধু কিঙ্কিণী-কণিতা,
অকণিতা বাণী তা'র কার সুরে ধরনিতা ॥



ছন্দোমাধুরী

পাশাণে বাঁধা কঠোর পথ
চলেছে তাহে কালের রথ,
যুরিছে তা'র মমতাহীন চাকা
বিরোধ উঠে ঘর্ষরিয়া
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
ভ্রমণতরা তপ্ত বালুঢাকা ।
নিষ্ঠুর লোভ জগৎ ব্যোপে'
দুর্ক্বলোরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসা-হলাহল ।
অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধূলার 'পরে
লজ্জাহীন বেস্বর কোলাহল ।

বীথিকা

হতাশ হয়ে য়েদিকে চাহি

কোথাও কোনো উপায় নাই,

মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা ।

করণাহীন দারুণ ঝড়ে

দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে

অন্যায়ের প্রলয়ানল শিখা ।

সহসা দেখি সুন্দর হে,

কে দূতী তব ভারতা বহে

ব্যাঘাত মাঝে অকালে অস্থানে ।

ছুটিয়া আসে গহন হতে

আত্মহারা উছল স্রোতে

রসের ধারা মরুভূমির পানে ।

ছন্দভাঙা হাটের মাঝে

তরল তালে নূপুর বাজে,

বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে ।

কর্কশেরে নৃত্য হানি'

ছন্দোময়ী মূর্তিখানি

ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে ।

বীথিকা

ভরিয়। ঘট অমৃত আনে

সে কথা সে কি আপনি জানে,

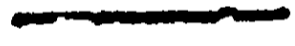
এনেছে বহি' সীমাহীনের ভাষা ।

প্রবল এই মিথ্যার।শি,

তা'রেও ঠেলি' উঠেছে হাসি'

অবলা-রূপে চিরকালের আশা ॥

১১ চৈত্র, ১৩৩৮



বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ

—হেন অপবাদ

যখন ঘোষণা করে উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে

ভাবি মনে মনে

ক্রোধের উদ্ভাপ তার

তোমার আপন অহঙ্কার ।

মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব কে না জানে চিরকাল আছে

সৃষ্টির গম্বীর কাছে ।—

না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি’

বিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী ।

বিধাতার ’পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ

মৃত্যুছুখে করে যবে ভোগ ;

মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়

এ জীবনে দুঃখমূল্য যা অমর্ত্য যা, যা—কিছু অক্ষয় ।

বীথিকা

ভাঙনের আক্রমণ

সৃষ্টি কর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ ।

দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়,

রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয় ।

বহুভাগা সেই

জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই

নির্দোষ যা নয় ।

দুঃখ লজ্জা ভয়

ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে

রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে ।

এই ক্রটি দেখেছি যখন

শুনিনি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন

যুগে যুগে উচ্ছ্বসিতে থাকে ;

দেখিনি কি আর্তচিহ্ন উদ্বোধিয়া রাখে

মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে ?

উৎপীড়িত সেই জাগরণে

তন্দ্রাহীন যে মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে

নমস্কার জানাই তাহারে ।

বীথিকা

নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্রহাতে
কণ্ঠকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে
মরণেরে হানি',
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি ॥

শ্রাবণ, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন



রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,

গানের বেলা আজ ফুরালো ।

কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা ?

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,

অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায় তোলে সে যে—

দিনের অতি নিষ্ঠুর খর তেজে

যে-ফুল ফুটিল না,

যাহার মধুকণা

বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল ব'লে

গিয়েছে কবে আকাশপথে চ'লে

তোমার উপবনের মৌমাছি

রূপণ বনবাঁথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি' ॥

বীথিকা

অঁধারে-ফোটা সে-ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে-ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার ;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে-ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো অঁথিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী ;
সে শুধু আনে পাইনি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটেনি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি ।

স্বপনে-ঘেরা স্তূর তারি নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা ;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা ক'বে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ ॥

নব পরিচয়

জন্ম মোর বহি' যবে

খেয়ার তরী এল ভবে

যে-আমি এল সে-তরীখানি বেয়ে,

ভাবিয়াছিনু বারে বারে

প্রথম হতে জানি তা'রে

পরিচিত সে পুরানো সব চেয়ে ।

হঠাৎ যবে হেনকালে

আবেশ-কুহেলিকাজালে

অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি'

আমার নব পরিচয়

চমকি' উঠে মনোময়

নৃতন সে যে নৃতন তা'রে জানি ।

বীথিকা

বসন্তের ভরা স্রোতে

এসেছিল সে কোথা হতে

বহিয়া চিরযৌবনেরি ডালি ।

অনন্তের হোমানলে

যে যজ্ঞের শিখা জ্বলে,

সে শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি' ।

মিলিয়া যায় তারি সাথে

আশ্বনেরি নব প্রাতে

শিউলি বনে আলোটি যাহা পড়ে,

শব্দহীন কলরোলে

সে নাচ তারি বুকে দোলে

যে নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে ।

এ সংসারে সব সীমা

ছাড়ায়ে গেছে যে মহিমা

ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,

বীথিকা

মরণ করি' অভিভব

আছেন চির যে-মানব

নিজেরে দেখি সে পথিকের পথে।

সংসারের চেউখেলা

সহজে করি' অবহেলা

রাজহংস চলেছে যেন ভেসে —

সিক্ত নাহি করে তা'রে

মুক্ত রাখে পাখাটারে—

উর্দ্ধশিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি

কী সঙ্গীতে উঠে বাজি',

বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বৃকে।

সকল লাভ সব ক্ষতি

তুচ্ছ আজি হোলো অতি

দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার স্থখে।

২৯ এপ্রিল, ১৯৩৪

শান্তিনিকেতন

মরণ-মাতা

মরণ-মাতা, এই যে কচি প্রাণ,
বুকের এ যে ছুলাল তব, তোমারি এ যে দান ।
ধূলায় যবে নয়ন অঁধা,
জড়ের স্তূপে বিপুল বাধা,
তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান ।
নবদিনের জাগরণের ধন,
গোপনে তা'রে লালন করে তিমির আবরণ ।
পর্দা-ঢাকা তোমার রথে
বহিয়া আনো প্রকাশ-পথে
নৃতন আশা, নৃতন ভাষা, নৃতন আয়োজন ॥
চ'লে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা-ছিল তার কিছু ।
তাহাই ল'য়ে মন্ত্র পড়ি'
নৃতন যুগ তোলো যে গড়ি'
নৃতন ভালোমন্দ কত, নৃতন উঁচুনিচু ॥

বোধিকা

রোধিয়া পথ আমি না র'ব থামি',
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী ।
নিখিল-ধারা সে স্রোত বাহি'
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি,
অচলরূপে র'ব না বাঁধা অবিচলিত আমি ॥
সহজে আমি মানিব অবমান,
ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান ।
আজি রাতের যে ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি'
ঝরুক তা'রা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ ॥

মাতা

কুয়াসার জাল

আবরি' রেখেছে প্রাতঃকাল—

সেই মতো ছিনু আমি কতদিন

আত্ম পরিচয়হীন ।

অস্পর্শ স্বপ্নের মতো করেছিনু অনুভব
কুমারী চাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত গৌরব,

যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,

অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,

পুষ্পকোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন ।

তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,

অপূর্ব প্রভাত-রবি,

আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি,—

লভিলাম আপনার পূর্ণতারে

কাঙাল সংসারে ।

বোধিকা

প্রাণের রহস্য স্নগভীর

অন্তর-গুহায় ছিল স্থির,

সে আজ বাহির হোলো দেহ ল'য়ে উন্মুক্ত আলোতে

অন্ধকার হতে,

স্বর্দীর্ঘকালের পথে

চলিল স্বদূর ভবিষ্যতে ।

যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে,

গৃহের কোণের তাহা নহে ।

আমার হৃদয় আজি পান্থশালা,

প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা' ।

হেথা করে ডেকে আনিলাম

অনাদিকালের পান্থ কিছু কাল করিবে বিশ্রাম ।

এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে

আকাশে আকাশে নৃত্য-গানে—

আমার শিশুর মুখে কল-কোলাহলে

সে যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে ।

অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ,

আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ ।

বীথিকা

বন্ধনে দিয়েছ ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন ;
আনন্দের ছন্দ টুটে' উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন

জননীর

এ বেদনা, বিশ্বধরণীর

সে যে আপনার ধন

না পারে রাখিতে নিজে নিখিলেরে করে নিবেদন।

৮ আগষ্ট, ১৯৩২

বরানগর

কাঠবিড়ালী

কাঠবিড়ালীর ছানা ছুটি

আঁচল-তলায় ঢাকা,

পায় সে কোমল করুণ হাতে

পরশ স্খামাথা।

এই দেখাটি দেখে এলেম

ক্ষণকালের মাঝে,

সেই থেকে আজ আমার মনে

স্বরের মতো বাজে।

টাঁপা গাছের আড়াল থেকে

একলা সাঁজের-তারা

একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী

জাগায় যেমন ধারা ;

বীথিকা

তরল কলধ্বনি যেমন

বাজে জলের পাকে

গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে

ছোটো নদীর বাঁকে,

লেবুর ডালে খুঁসি যেমন

প্রথম জেগে ওঠে

একটু যখন গন্ধ নিয়ে

একটি কুঁড়ি ফোটে ;

ছপুর বেলায় পাখী যেমন

—দেখতে না পাই যাকে—

ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন

মুছল সুরে ডাকে ;

তেম্নিতরো ঐ ছবিটির

মধু রসের কণা

ক্ষণকালের তরে আমায়

করেছে আনন্দনা ।

ছুঃখ স্খের বোঝা নিয়ে

চলি আপন মনে,

বীথিকা

তখন জীবন-পথের ধারে
গোপন কোণে কোণে,
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মী দেবীর মালার থেকে
ছিন্ন প'ড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকুরো রতন কত,---
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মতো ॥

২২ আষাঢ়, ১৩৪১

শান্তিনিকেতন

সাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে,
শিমুল গাছের তলে কাঁকর-বিছানো পথ বেয়ে ।
মোটো শাড়ি আঁট ক'রে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন কালো পাখীটির গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি'
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি ।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া ।
নিটোল দু-হাতে তার শাদা-রাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,
মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া আসা করে বার-বার ।

বীথিকা

আঁচলের প্রান্ত তা'র

লাল রেখা ছুলাইয়া

পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া ।

পউষের পালা হোলো শেষ,

উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিং আবেশ ।

হিম-ঝুড়ি শাখা 'পরে

চিকণ চঞ্চল পাতা বলমল করে

শীতের রোদুদুরে ।

পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদুরে ।

আমলকী-তলা ছেয়ে খ'সে পড়ে ফল,

জোটে সেথা ছেলেদের দল ।

আঁকাবাঁকা বন-পথে আলোছায়া গাঁথা,

অকস্মাৎ ঘুরে' ঘুরে' ওড়ে বারা পাতা

সচকিত হাওয়ার খেয়ালে ।

ঝোপের আড়ালে

গলা-ফোলা গির্গিটি শুরু আছে ঘাসে ।

ঝুড়ি নিয়ে বার-বার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে ।

বীথিকা

আমার মাটির ঘরখানা

আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা ।

ধীরে ধীরে ভিৎ তোলে গেঁথে

রৌদ্রে পিঠ পেতে ।

মাঝে মাঝে

সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে ;

প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে,

ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত আকাশে ।

আমি দেখি চেয়ে,

ঈশৎ সঙ্কোচে ভাবি,—এ কিশোরী মেয়ে

পল্লীকোণে যে ঘরের তরে

করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে

নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা

শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,

আমি তা'রে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরী,

মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি

পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি ।

সাঁওতাল মেয়ে ওই বুড়ি ভ'রে নিয়ে আসে মাটি ॥

৪ মাঘ, ১৩৪১

শান্তিনিকেতন

মিলন-যাত্রা

চন্দন ধূপের গন্ধ ঠাকুর-দালান হতে আসে,

শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে

শিউলির তল

আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল

ফুলের সর্বস্ব নিবেদনে ।

গ্রহিণীর মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গণে

আনিয়াছে বহি' ;

বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি' রহি' ;

শরতের সোনালি প্রভাতে

যে আলো-ছায়াতে

খচিত হয়েছে ফুলবন

মৃতদেহ আবরণ

আশ্বিনের সেই ছায়া আলো

অসঙ্কোচে সহজে সাজালো ॥

বীথিকা

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরণী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, “মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে ।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁ দুর দিয়ো টানি” ॥
যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে-দুয়ার,
উত্তীর্ণ হোলো সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে ।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু ।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড অস্ত হোলো তার,
ধনে জনে আছিল যে অব্যাহত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে ।
যে আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হোলো নিজে ।

বীথিকা

প্রিয়-মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার পথে
রমণীর এই চির-প্রস্থানের ক্ষণে—
পাড়িছে আরেক দিন মনে ॥

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন ;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুর চারিধারে ।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম-এ ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে ।
শোভনদর্শন যুবা, সব চেয়ে প্রিয় জননীর,
বউ-দিদিমগুলীর
প্রশ্রয়ভাজন ।
পূজার উদ্যোগে মেশে তারো লাগি পূজার সাজন ॥

বীথিকা

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে
বন্ধুঘর হতে ; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো ।

অনুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে ।

বালক রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাভ্য যেত বেড়ে ;
সদ্য-বাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল ;

চুরি ক'রে খাতা খুলে'
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে ।
গৃহিণী হাসিত দেখি' দুজনের এ ছেলেমানুষি,
কভু রাগ কভু খুসি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা-বলা ॥

বীথিকা

বহুদিন গেল তার পর ।

প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর ।

হেনকালে একদা প্রভাতে

গৃহিণীর হাতে

চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি’

রঙান কাগজে লেখা পত্র একখানি ।

অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে

বিবাহ প্রস্তাব করি’ তারে ।

বলেছিল, “মায়ের সম্মতি

অসম্ভব অতি ।

জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে

ঠেকিবে আচারে ।

কথা যদি দাও, প্রমি, চুপি চুপি তবে

মোদের মিলন হবে

আইনের বলে ॥”

দুর্বিষমহ ক্রোধানলে

জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি’ ।

বীথিকা

দেওয়ান্কে দিল কহি'—

“এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি' দাও একেবারে ।”

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,

“করিয়ো না ভুল ;

অপরাধ নাই প্রমিতার,

সন্মতি পাই নি আজো তার ।

কত্রী তুমি এ সংসারে,

তাই ব'লে অবিচারে

নিরাশ্রয় করি' দিবে অনাথারে—হেন অধিকার

নাই, নাই, নাইকো তোমার ।

এই ঘরে ঠাই দিল পিতা ওরে,

তারি জোরে

হেথা ওর স্থান

তোমারি সমান ।

বিনা অপরাধে

কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে ॥”

বীথিকা

ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের বহিঃ দিল মাতৃমন ছেয়ে,—

“ঐ টুকু মেয়ে

আমার সোনার ছেলে পর করে,

আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে !

অপরাধ ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই চের,

সীমা নেই এ অপরাধের ।

যত তর্ক করো তুমি, যে যুক্তি দাও না

ইহার পাওনা

ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর ।

আমারি এ ঘর,

আমারি এ ধনজন,

আমারি শাসন,

আর কারো নয়

আজই আমি দেব তার পরিচয় ॥”

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার

খুলে দিল সব অলঙ্কার ।

পরিল মিলের শাড়ি মোটা-সূতা-বোনা ।

বীথিকা

কানে ছিল সোনা,
—কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার—
বাক্সে তুলি' রাখিল শয্যায় ।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায় ॥

যবে হতে গেল পার
সদরের দ্বার
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে ;
কহিল সে, “এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হোলো এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার ।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দৌছে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো ॥”

৫ ভাদ্র, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

অন্তরতম

আপন মনে যে-কামনার চলেছি পিছু-পিছু

নহে সে বেশি কিছু ।

মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,

ভ্রমিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,

পর্ণপুটে একটু শুধু জল,

উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল ।

সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের

বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের ।

হাটের হাওয়া ধূলায় ভরপুর

তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর—

সকল হতে দুর্লভ তা তবু সে নহে বেশি ;—

বৈশাখের তাপের শেষাশেষি

আকাশ-চাওয়া শুষ্ক মাটি 'পরে

হঠাৎ ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে

এক-পসলা বৃষ্টি বরিষণ,

বীথিকা

দুস্বপন বন্ধে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন ;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না-জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার ।
অনেক ছুরাশারে
সাধনা ক'রে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তা'রে ।
যে-পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হোলো আসন পাতা,
খ্যাতি-স্মৃতির পাষণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে,—
এই যা দান গিয়েছে মিশে' গভীরতর প্রাণে,
করিনি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার যায় না দেখা যারে
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে ।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

শান্তিনিকেতন

বনস্পতি

কোথা হতে পেলো তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,

হে তরু প্রবীণ ।

প্রতিদিন

জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে,

প্রতিদিন আসো তুমি সেজে

সদ্য জীবনের মহিমায় ।

প্রাচীরের সমুদ্রসীমায়

নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে

তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে,

বীথিকা

দিনে দিনে পথিকের দল

ক্লিষ্ট পদতল

তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রিপানে ধায় নিরুদ্দেশ,

আর তো ফেরে না তা'রা, যাত্রা করে শেষ ।

তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্যমে,

স্বাতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে ।

প্রাণের নিবারণ-লীলা স্তব্ধ রূপান্তরে

দিগন্তে পুলকিত করে ।

তপোবন বালকের মতো

আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত

সঞ্জীবন সামমন্ত্রগাথা ।

তোমার পুরানো পাতা

মাটির করিছে প্রত্যর্পণ

মাটির যা মর্ত্যধন ;

মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে

মর্ষরিত আনন্দের সুরে ।

সেইক্ষণে নব কিশলয়

রবিকর হতে করে জয়

বীথিকা

প্রচ্ছন্ন আলোক,—

অমর অশোক

সৃষ্টির প্রথম বাণী ;

বায়ু হতে লয় টানি'

চিরপ্রবাহিত

নৃত্যের অমৃত ॥

২ আগষ্ট, ১৯৩২

—

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন ।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্য-বলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ ।
মানুষের বশ-মানা এই যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি ?
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারিধারে ।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে ।
দাঁড়িয়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসঙ্গমে
হাটের পথের ধারে ।
নম্র পত্রভারে
কিঙ্করের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত ।

বীথিকা

লীলা-কাননের মাপে

তোমাতে করেছি খর্ব্ব । য়ুতু কলালাপে

করো চিত্ত বিনোদন

এ ভাষা কি তোমার আপন ?

একদিন এসেছিলে আদি বনভূমে ;

জীবলোক মগ্ন যুমে,

তখনো মেলেনি চোখ,

দেখেনি আলোক ।

সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা

ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা ।

ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে

সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হোলে দিকে দিগন্তরে ।

লতায় গুল্মেতে ঘন, য়ুতগাছ শুষ্ক পাতা ভরা

আলোহীন পথহীন ধরা ;

অরণ্যের আদ্র'গন্ধে নিবিড় বাতাস

যেন রুদ্ধশ্বাস

চলিতে না পারে ।

সিঞ্চুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে

বীথিকা

গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে ;

ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে ;

প্রচণ্ড নির্ঘোষে

বহু তরুভার বহি' বহুদূর মাটি যায় ধ্ব'সে

গভীর পঙ্কের তলে ।

সেদিনের অন্ধ যুগে পীড়িত সে জলে স্থলে

তুমি তুলেছিলে মাথা ।

বলিত বঙ্কলে তব গাঁথা

সে ভীষণ যুগের আভাস ।

যেথা তব আদি বাস

সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে

দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে ।

হে তুমি অমিত আয়ু, তোমার উদ্দেশে

স্তবগান করেছে সে ।

বাঁকা-চোরা শাখা তব কত কী সঙ্কতে

অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে ।

বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তা'রা

তোমার ছুর্গমে দিশাহারা ।

বীথিকা

আদিম সে আরণ্যক ভয়

রক্তে নিয়ে এসেছিলু আজিও সে কথা মনে হয় ।

বটের জটিল মূল আঁকা বাঁকা নেমে গেছে জলে ;

মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে

দৃষ্টি মোর চ'লে যেত ভয়ের কোঁতুকে,—

ছুরু ছুরু বুকে

ফিরাতেম নয়ন তখনি ।

যে মূর্তি দেখেছি সেথা, শুনেছি যে ধ্বনি

সে তো নহে আজিকার ।

বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি সে তোমার ।

হে ভীষণ বনস্পতি,

সেদিন যে নতি

মন্ত্র পড়ি' দিয়েছি তোমারে,

আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে একধারে ॥

সন্ন্যাসী

হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর,
মন্দাকিনী প্রসারিল কত না নিঝর

তোমাতে বেষ্ঠন করি' নৃত্যজালে ।

তব উচ্চভালে

উৎক্ষিপ্ত শীকর-বাষ্পে বাঁকা ইন্দ্রধনু

রহে তব শুভ্রতনু

বর্ণে বর্ণে বিচিত্র করিয়া ।

কলহাস্ত্রে মুখরিয়া

উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীতে করে পরিহাস,

ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ ;—

নাহি মনে ভয়,

দূরে নাহি রয়,

দুর্ব্বার ছরন্তু তা'রা শাসন না মানে,

তোমাতে আপন সাথী জানে ।

বীথিকা

সকল নিয়ম-বন্ধহারা

আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তা'রা

বাহু তব ধরি' ।

তুমি মনে মনে হাসো ভঙ্গীর দ্রাকুটি লক্ষ্য করি' ।

এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দামের দল

চরাচর ঘেরি' ঘেরি' করিছে উন্মত্ত কোলাহল

সমুদ্রে তরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,

যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে ।

আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য নিরন্তর তব শান্তি নাশি',

এই তো তোমার পূজা, জানো তাহা হে ধীর সন্ন্যাসী ॥

৩ আগষ্ট, ১৯৩২

হরিণী

হে হরিণী,

আকাশ লইবে জিনি'

কেন তব এ অধ্যবসায় ।

স্বদূরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়,

কালো চোখে পড়ে তার স্বপ্নরূপ লিখা ;

এ কি মরীচিকা,

পিপাসার স্বরচিত মোহ,

এ কি আপনার সাথে আপন বিদ্রোহ ।

নিজের দুঃসহ সঙ্গ হতে

ছুটে যেতে চাও কোনো নূতন আলোতে—

নিকটের সঙ্কীর্ণতা করি' ছেদ

দিগন্তের নব নব যবনিকা করি' দিয়া ভেদ ।

আছ বিচ্ছেদের পারে,

যারে তুমি জানো নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে—

বীথিকা

সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে

বনে, মাঠে, গিরিতটে, নদীতীরে,—

জানায়েছে অপূর্ব বারতা

কত শত বসন্তের আত্মবিহ্বলতা ।

তারি লাগি বিশ্বভোলা মহা অভিসার

হয়েছে দুর্বার,

অদৃশ্যেরে সন্ধানের তরে

দাঁড়ায়েছ স্পর্ধাভরে,

একান্ত উৎসুক তব প্রাণ

আকাশেরে করে স্রাণ,—

কর্ণ করিয়াছে খাড়া,

বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর পায় সাড়া ॥

১৬ শ্রাবণ, ১৩৩৯

গোধূলি

প্রাসাদ-ভবনে নিচের তলায়

সারাদিন কত মতো

গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত ।

সেথা তুমি তব গৃহ-সীমানায়

বহু মানুষের সনে

শত গাঁঠে বাঁধা কস্মের বন্ধনে ।

দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা

ধূসর রক্তরাগে

ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে ;

নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক

উড়িল আকাশতলে,

শেষআলো-আভা মিলায় নদীর জলে ।

হাওয়া থেমে যায়, বনের শাখায়

আঁধার জড়িয়ে ধরে ;

নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে ।

বীথিকা

তখন একাকী সব কাজ রাখি'—

প্রাসাদ-ছাদের ধারে

দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে

জানি না তখন কী যে নাম তব

চেনা তুমি নহ আর

কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার ।

সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী

সুদূর সন্ধ্যাতারা,

সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা,

দিবস রাতির সীমা মিলে যায়,

নেমে এসো তারপরে

ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে ॥

বাধা

পূর্ণ করি' নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি',
ব্যর্থ হোলো পথ-খোঁজা,
কহিল, “হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘ্যের বোঝা ;
আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেমণে
একান্ত পীড়িত আর্ত, তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে, এ প্রেম তুমিই লও প্রভু।”
“লও, লও,” বারবার ডেকে বলে, তবু
দিতে পারে না যে তাকে
রূপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।
যেমন তুমাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা
দেয় তা'রে ব্যথা ;

বীথিকা

তেমনি সে নারী

নিশ্চল হৃদয়ভারে ভারী

কেঁদে বলে, “কী ধনে আমার প্রেম দামী

সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী

তুমিও কি এরে চিনিবে না ?

মানবজন্মের সব দেনা

শোধ করি’ লও, প্রভু, আমার সর্বস্ব রত্ন নিয়ে ।

তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ ?”

“লও লও,” যত বলে, খোলে না যে তা’র

হৃদয়ের দ্বার ।

সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,—

“লও তুমি লও ভগবান” ।

৩ আগষ্ট, ১৯৩২

দুই সখী

দুজন সখীরে

দূর হতে দেখেছিঁনু অজানার তীরে ।

জানিনে কাদের ঘর; দ্বার খোলা আকাশের পানে,

দিনান্তে কহিতেছিল কী কথা কে জানে ।

এক নিমিষেতে

অপরিচয়ের দেখা চ'লে যেতে যেতে

উপরের দিকে চেয়ে ।

দুটি মেয়ে

যেন দুটি আলো কণা

আমার মনের পথে ছায়াতলে করিল রচনা

ক্ষণতরে আকাশের বাণী,

অর্থ তার নাহি জানি ।

বীথিকা

যাহারা ওদের চেনে

নাম জানে, কাছে লয় টেনে,

একসাথে দিন যাপে

প্রত্যহের বিচিত্র আলাপে

ওদের বেঁধেছে তা'রা ছোটো ক'রে

পরিচয় ডোরে ।

সত্য নয়

ঘরের ভিত্তিতে ঘেরা সেই পরিচয় ।

যাবে দিন

সে জানা কোথায় হবে লীন ।

বন্ধহীন অনন্তের বক্ষতলে উঠিয়াছে জেগে

কী নিঃশ্বাস বেগে

যুগল তরঙ্গ সম ।

অসীম কালের মাঝে ওরা অনুপম,

ওরা অনুদ্দেশ,—

কোথায় ওদের শেষ

ঘরের মানুষ জানে সে কি ?

নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেনু দেখি,—

বীথিকা

আশ্চর্য্য সে-লেখা ;—

সে-তুলির রেখা

যুগ যুগান্তর মাঝে একবার দেখা দিল নিজে,

জানিনে তাহার পরে কী যে ॥

পথিক

তুমি আছ বসি' তোমার ঘরের দ্বারে
ছোটো তব সংসারে ।
মনখানি যবে ধায় বাহিরের পানে
ভিতরে আবার টানে ।
বাঁধনবিহীন দূর
বাজাইয়া যায় সুর,
বেদনার ছায়া পড়ে তব অঁাখি 'পরে,
নিঃশ্বাস ফেলি' মন্দগমন ফিরে চলে যাও ঘরে ॥

আমি যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে,
দূরের আকাশে চেয়ে,
তোমার ঘরের ছায়া পড়ে পথ পাশে,
সে ছায়া হৃদয়ে আসে ।

বীথিকা

যত দূরে পথ যাক্

শুনি বাঁধনের ডাক,

ক্ষণেকের তরে পিছনে আমায় টানে

নিঃশ্বাস ফেলি' ত্বরিত-গমন চলি সম্মুখ পানে ॥

উদার আকাশে আমার মুক্তি দেখি'

মন তব কাঁদিছে কি ?

এ মুক্তি পথে তুমি পেতে চাও ছাড়া,

দুয়ারে লেগেছে নাড়া ।

বাঁধনে বাঁধনে টানি'

রচিলে আসনখানি,

দেখিনু তোমার আপন সৃষ্টি তাই

শূন্যতা ছাড়ি' স্নন্দরে তব আমার মুক্তি চাই ॥

৩ আগষ্ট, ১৯৩২

অপ্রকাশ

মুক্ত হও হে সুন্দরী ।

ছিন্ন করো রঙীন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ ।

সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমাতে বেষ্টন করি' জড়ায়েছে অম্পাশের মায়া
শতপাকে,
মোহ দিয়ে সৌন্দর্য্যে করেছে আবিলা ;
অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি ।

তাই তোমাতে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে ।

ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি,
প্রদোষের জ্যোতিঃ-ক্ষীণতায়

বীথিকা

দেখিতে পেলেন না আজো আপনারে উদার আলোকে,—
বিশ্বেরে দেখেনি, ভীক, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি' ।

স্বরচিত সঙ্কোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন ।
বিকশিত স্থলপদ্য পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি' ।
ছায়াচ্ছন্ন যে-লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি',
সত্তার ঘোষণা-বাণী স্তব্ধ করে,

জেনো সে অশুচি ।

উর্দ্ধশাখা বনস্পতি যে-ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা,

সম্মত সে বিনয় ।

মাটিতে লুটিছে গুল্ম সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি',
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কাঁটের নিবাস ।

হে সুন্দরী,

মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ,
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ ।

বীথিকা

সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ,—
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ,
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন ল'য়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে ॥



দুর্ভাগিনী

তোমার সম্মুখে এসে দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন,

নত হয় মন ।

যেন ভয় লাগে

প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে

এ কী দুঃখভার,

কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ অন্ধকার

ব্যাপ্ত ক'রে আছে তব সমস্ত জগৎ,

তব ভূত ভবিষ্যৎ !

প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা,

অভ্রভেদী ব্যথা

দাবদন্ধ পর্বতের মতো

খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত

ল'য়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্তূপ

ভীষণ বিরূপ ।

বীথিকা

সব সাস্ত্রনার শেষে সব পথ একেবারে

মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;

ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,

খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে,—

খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,

বুকের পাথর হোলো মুহূর্তেই ।

চির-চেনা ছিল চোখে-চোখে

অকস্মাৎ মিলাল অপরিচিত লোকে ।

দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বলাইতে গেল ধূপ,

সেখানে বিদ্রূপ ।

সর্বশূন্যতার ধারে

জীবনের পোড়ো ঘরে অপরুদ্ধ দ্বারে

দাও নাড়া ;

ভিতরে কে দিবে সাড়া ?

মূর্ছাতুর অঁধারের উঠিছে নিশ্বাস,

ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস ।

বীথিকা

তার কাছে নত হয় শির
চরম বেদনাম্বলে উর্দ্ধচূড় যাহার মন্দির ॥
মনে হয় বেদনার মহেশ্বরী
তোমার জীবন ভরি'
দুষ্কর তপস্യാমগ্ন, মহাবিরহিণী
মহাদুঃখে করিছেন ঋণী
চিরদয়িতেরে ।
তোমাতে সরালো শত ফেরে
বিশ্ব হতে বৈরাগ্যের অন্তরাল ।
দেশকাল
রয়েছে বাহিরে ।
ভূমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে ।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন ?

৬ আগষ্ট, ১৯৩২

জোড়াসাঁকো

গরবিনী

কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাকো দূরে দূরে
মর্ত্যধূলি 'পরে ঘৃণা বাজে তব নূপুরে নূপুরে ।

তুমি যে অসাধারণ, তীরে একা তুমি,

আকাশ-কুম্ভমসম অসংস্কৃত রয়েছ কুম্ভমি' ।

বাহিরের প্রসাধনে যত্নে তুমি শুচি ;

অকলঙ্ক তোমার কৃত্রিম রুচি ;

সর্বদা সংশয়ে থাকো পাছে কোথা হতে

হতভাগ্য কালো কীট পড়ে তব দীপের আলোতে

স্ফটিকেতে ঢাকা ।

অসামান্য সমাদরে আঁকা

তোমার জীবন

রূপণের-কক্ষে-রাখা ছবির মতন

বহুমূল্য যবনিকা অন্তরালে ;—

ওগো অভাগিনী নারী, এই ছিল তোমার কপালে,

আপন প্রহরী তুমি নিজে তুমি আপন বন্ধন ।

বীথিকা

আমি সাধারণ ।

এ ধরাতলের

নির্বিচার স্পর্শ সকলের

দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে

সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে ।

মুক্ত আমি ধূলিতলে

মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে ।

যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে

শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে ।

সম্মুখে আমার দেখো শালবন,

সে যে সাধারণ ।

সবার একান্ত কাছে

আপনা-বিস্মৃত হয়ে আছে ।

মধ্যাহ্ন বাতাসে

শুক পাতা ঘুরাইয়া ধূলির আবর্ত ছুটে আসে,—

শাখা তার অনায়াসে দেয় নাড়া,

পাতায় পাতায় তার কোঁতুকের পড়ে সাড়া ।

বীথিকা

তবু সে অম্লান শুচি, নিশ্চল নিঃশ্বাসে
চৈত্রের আকাশে
বাতাস পবিত্র করে স্নগন্ধ বীজনে ।
অসঙ্কোচ ছায়া তার প্রসারিত সর্বসাধারণে ।
সহজে নিশ্চল সে যে
দ্বিধাহীন জীবনের তেজে ॥

আমি সাধারণ ।

তরুর মতন আমি নদীর মতন ।

মাটির বৃকের কাছে থাকি
আলোরে ললাটে লই ডাকি’
যে আলোক উচ্চনীচ ইতরের,
বাহিরের ভিতরের ।
সমস্ত পৃথিবী তুমি অবজ্ঞায় করেছ অশুচি,
গরবিণী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি’
আপনার অন্তরে রহিতে অমলিনা,
হায় তুমি নিখিলের আশীর্বাদহীনা ॥

৪ আগষ্ট, ১৯৩২

প্রলয়

আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে দূর ব'লে জানি,

মনে তারে দূর নাহি মানি ।

কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক না নিষ্ঠুর

তবু সে দুঃসহ নহে দূর ।

আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,

চেতনা আবিল করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ,

শুধু এই মাত্র নয়,

সে যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয় ।

ছায়া দিয়ে রচি' তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,

জানারে অজানা করে, ঘেরে তা'রে অর্থহীনা মায়া ।

পথ লুপ্ত ক'রে দিয়ে যে-পথের করে সে নির্দেশ,

নাই তার শেষ ।

সে পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে

ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে ।

বীথিকা

অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া যে প্রলয় আনে মহাকাল,
চন্দ্র সূর্য্য লুপ্ত করে আবর্তে ঘূর্ণিত জটাজাল,
দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে,
বজ্রের ঝঙ্কনামন্দ্রে বক্ষে তা'র রুদ্রবীণা বাজে ।
যে বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তা'র
পবিত্র সংকার ।

জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝঙ্কার বাতাসে ।
অবশেষে তপস্বীর তপস্যা-বহির শিখা হতে
নব সৃষ্টি উঠে' আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে ।

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুদে' ।
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি', বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর ।
উদয়-দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি'

বীথিকা

সংশয়ের ডোরে ;

ভক্তিপাত্র শূন্য করি' শ্রদ্ধার অমৃত লয় হ'রে ।

মুক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,

জগদল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর ॥

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

কলুষিত

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যশ্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্ব-ধরণী
দিবস রজনী ।

হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে ।

আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি'
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্ব্বাদ-টীকা ।

উষা দিব্য দীপ্তিহার।
তোমার দিগন্তে এসে । রজনীর তারা
তোমার আকাশ-দুর্ঘট জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার,
বিস্মৃক নিদ্রার

বীথিকা

আলোড়নে ধ্যান তা'র অস্বচ্ছ আবিল,

হারাল সে মিল

পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত সাথে

শান্তিহীন রাতে ।

হেথা স্নন্দরের কোলে

স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হোলো ব'লে

উদ্ধত হয়েছে উর্দ্ধে বীভৎসের কোলাহল,

কৃত্রিমের কারাগারে বন্দিদল

গর্ষভরে

শৃঙ্খলের পূজা করে ।

দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে

আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে'

ইতরের অহঙ্কার ;

গোপন দংশন তার ;

অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা

সৌজন্য-সংযমনাশা ।

দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা

মুখোষের অন্তরালে করে শ্লাঘা ;

বীথিকা

স্বরঙ্গ খনন করে,
ব্যাপি' দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ;
এই নিয়ে হাতে বাটে বাঁকা কটাক্ষের
ব্যঙ্গভঙ্গী, চতুর বাক্যের
কুটিল উল্লাস,
ক্রুর পরিহাস ।

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয় ।
ছদ্মবেশ অপগত
শক্তির সরল তেজে সমুদ্রত দাবাগ্নির মতো
প্রচণ্ড নির্ঘোষ ;
নির্মল তাহার রোষ,
তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা ।
প্রাণশক্তি তার মাঝে
অক্ষুণ্ণ বিরাজে ।

বীথিকা

স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন,

গর্ত-খোদা ক্রিমিগণ

তারি অনুচর,

অতি ক্ষুদ্র তাই তা'রা অতি ভয়ঙ্কর ;

অগোচরে আনে মহামারী,

শনির কলির দত্ত সর্বনাশ তারি ।

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি'

প্রবল মৃত্যুর লাগি' ।

রুদ্ধ, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,

নীচতার ক্লেদপক্ষে করো রক্ষা ভীষণ, পাবন !

তাণ্ডব নৃত্যের ভরে

দুর্বলের যে গ্লানিরে চূর্ণ করো যুগে যুগান্তরে

কাপুরুষ নিজ্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি

বিলুপ্ত করিয়া দিক্ উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি ॥

১৪ ভাদ্র, ১৩৪২

শাস্তিনিকেতন

অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে

শত শত পথে ।

তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয় ।

দিকুলক্ষ্মী গাহিল না জয় ;

আজো রাজটীকা

ললাটে হোলো না তার লিখা

নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,

অক্ষুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল ।

সে কি নিজে জানে

আসিছে সে কী লাগিয়া,

আসে কোন্ খানে ।

বীথিকা

যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা

তার অভ্যর্থনা

কোন্ ভবিষ্যতে ;

কোন্ অলঙ্কিত পথে

আসিতেছে অর্ঘ্যভার ।

আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার --

“মুখ তোলো,

আবরণ খোলো,

হে বিজয়ী, হে নিভাঁক,

হে মহা-পথিক,

তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে

মুক্তির সঙ্কেত-চিহ্ন

যাক্ লিখে লিখে ।”

বর্ষশেষ, ১৩৩৯



প্রতীক্ষা

(গান)

আজি বরষণ-মুখরিত
শ্রাবণ-রাতি ।
স্মৃতি-বেদনার মালা
একেলা গাঁথি ॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি'
অঁধার ঘরেতে রাখি
দুয়ার খুলি',
মনে হয় বুঝি আসিবে সে
মোর দুখ-রজনীর
মরম-সাথী ॥

বীথিকা

আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,

নীপবনে পুলক জাগায়ে ।

যদিও বা নাহি আসে

তবু বৃথা আশ্বাসে

মিলন-আসনখানি

রয়েছি পাতি' ॥

২১ শ্রাবণ, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন



মুঠু

(রমাদেবীৰ মৃত্যু উপলক্ষ্যে)

ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হোলো অধীর মর্মর কলরবে ।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে,
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান ॥

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্নতনু বয়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্বাদ ল'য়ে
আশা করেছিনু মনে মনে
নব বসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কানন-লক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্ঘ্যদান ॥

বীথিকা

এবার দক্ষিণবায়ু দুঃখের নিঃশ্বাস এল ব'হে ;
তুমি তো এলে না ফিরে ; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকার ছায়ায় আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্ঝাকবাণী বৈরাগ্য-করণ ক্লান্ত সুরে,
তাহারি রগন-ধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে ॥

শিশুকাল হতে হেথা স্মৃতে দুঃখে ভরা দিনরাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত ।
কাশের মঞ্জরী-শুভ্র দিশা ;
নিস্তরু মালতীবারা নিশা ;
প্রশান্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত, শিশিরে ছলোছলো ;
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্য্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো ॥

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,—
তবুও সে আজ হতে চিরকাল র'বে তুমি-হীন ।

বীথিকা

ব'সে আমাদের মাঝখানে
ক'ভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না সুখ-সন্ধ্যা, মনে হয় অসম্ভব অতি,
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি ॥

বারে বারে নিতে তুমি গীতিশ্রোতে কবি-আশীর্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি' ।

জীবনের দেওয়া-নেওয়া সেই

ঘুচিল অন্তিম-নিমেষেই ;

স্নেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নিশ্চাল্য সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার ॥

হায় হায় এত প্রিয় এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়

একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয় ।

হে অসীম, তব বক্ষণমাঝে

তার ব্যথা কিছুই না বাজে,

সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায় ;—

স্তব্ধ-বীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি হায় হায় ॥

বীথিকা

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে ।

আমাদের আশ্রম-উৎসব

যখনি জাগাবে গীতরব

তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর

অশ্রুর আভাস দিয়ে অভিষিক্ত করিবে অন্তর ॥

১৮ই মাঘ, ১৩৪১

শান্তিনিকেতন

বাদল-সন্ধ্যা

(গান)

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে

মনের ভুলে

তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার

দিলেম খুলে' ॥

এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে

মুখর নৃপুর বাজে না চরণে,

তাই হোক তবে তাই হোক, এসো

সহজ মনে ॥

ঐ তো মালতী ঝ'রে প'ড়ে যায়

মোর আঙিনায়,

শিথিল কবরী সাজাতে তোমার

লও না তুলে ।

না হয় সহসা এসেছ এ পথে

মনের ভুলে ॥

বীথিকা

কোনো আয়োজন নাই একেবারে,
স্বর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের

মৌন পারে ।

ঝর ঝর বারি ঝরে বনমাঝে,
আমারি মনের স্বর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন

উঠিছে ভুলে' ।

না হয় সহসা এসেছ এ পথে

মনের ভুলে ॥

২৩ শ্রাবণ, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরসুন্দর, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ;
সে মহা নৈশক্য মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি' ॥

আশ্ফালিছে লক্ষ লোল ফেন-জিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা,
তরঙ্গ-তাণ্ডবী মৃত্যু কোথা তার নাহি হেরি সোমা ;
সে রুদ্ধ সমুদ্রেতে ধ্বনিতোছে মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি' ॥

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকার পথে
আবর্তিছে বহিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে,
দুর্গম রহস্য ভেদি' সেথা উঠে মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি' ॥

বীথিকা

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল,
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি' ॥

চিত্তের গহনে যেথা ছুরস্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ,
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি' ॥

বাদল-রাত্রি

(গান)

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,

আজি এ নিবিড় তিমির যামিনী বিদ্যুৎ-সচকিতা ॥

বাদল বাতাস ব্যেপে'

হৃদয় উঠিছে কেঁপে,

ওগো সে কি তুমি জানো ?

উৎসুক এই দুখ-জাগরণ

একি হবে হায় বৃথা ॥

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,—

আমার ভবনদ্বারে

রোপন করিলে যারে,

সজল হাওয়ার করুণ পরশে

সে মালতী বিকশিতা,

ওগো সে কি তুমি জানো ?

বীথিকা

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি'
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি'
ওগো সে কি তুমি জানো ?
সেই যে তোমার বীণা, সে কি বিস্মৃতা ?
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা ॥

২৮ শ্রাবণ, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন



আধুনিক

(শ্রীমতী অপরাঞ্জিতা দেবীর পত্রের উত্তরে)

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর ।
কবি-গিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়,
যদি সন্দেহ করো এত বড়ো অবিনয়,
চূপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয় ।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা ।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্র
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর ।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে ।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হৃদম
বুকে লাগে যম-রথ-চক্রের কর্দম ।

বীথিকা

তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে ।
জীর্ণ জীবনে আজ রং নাই মধু নাই
মনে রেখো তবু আমি জন্মেছি অধুনাই ।
সাড়ে আঠারো শতক A. D., সে যে B. C. নয়,
মোর যারা মেয়ে বোন, নারদের পিসি নয় ।
আধুনিকা যারে বলো তারে আমি চিনি যে,
কবি-যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে ।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি ।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর ।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
স্বর-সৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে ।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরী-নিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে ।
সেকালেও কালিদাস বররুচি-আদিরা,
পুরস্কন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা,

বীথিকা

যাদের মহিমা-গানে জাগালেন বীণারে,
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে ।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা ।
পুরম্ব কবির ভালে আছে কোনো স্মগ্রহ
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নৃপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া, সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে ।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা ।
মিঠে আর কটু মিলে' মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি ।
মিষ্ট কটুর মাঝে কোন্টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে ।
ঐ দেখো, ওটা বুঝি হোলো শ্লেষবাক্য ।
এ রকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য ।

বীথিকা

প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সাম্ভ্রানো নাহি যায় অকারণ কটুতা ।
বারে বারে এই মতো করি অত্যাক্তি,
ক্ষমা ক'রে কোরো সেই অপরাধমুক্তি ॥

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই ।
অন্ন ভরিয়া দাও স্নান তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে ।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে ।
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে ।
পুরুষ পরুষ ভাসে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা ।
করুণায় ব'লে থাকো, “আহা, মন্দ বা কী !”
খুঁটে বের করো না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি ।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় ক'জনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা ।

বীথিকা

এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পারো যদি ভূলিতে ।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণ পবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে,
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনো যদি পারে মন মাতাতে
তাহোলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া ।
এ কী গেরো ! কাজ কী এ কল্পনা-বিহারে,
সেই স্টেমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে ।
ম'রে তবু বাঁচিবার আব্দার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি ।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই
এস্টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই ।
অতএব মন, তোর কল্মসি ও দড়ি আন,
অতলে মারিস্ ডুব **Mid-Victorian** ।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে,
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে ।

বীথিকা

গদগদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক্ ঠাট্টায় ঠাট্টায় ॥
তোমাদের মুখে থাক্ হাম্শের রোস্নাই,
কিছু সীরিয়াম কথা বলি তবু, দোষ নাই ।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী ।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই ।
জীবনের সঙ্ক্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবি-রেখা র'বে সোনা-আঁকা স্মরণে ।
সুর-সুরধূনাধারে যে-অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না ।
আমাদের কত ক্রটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে ।
প্রেম-দীপ জ্বলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তা'রা যত কিছু ভালোকে ।

বীথিকা

নানারূপে ভোগসুখা যা করেছে বরষণ
তারে শুচি করেছিল স্কুমার পরশন ।
দামী যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে ।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয় ।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা Cynical ।
কিছু আছে যার লাগি স্নগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে, ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস ।

একটু সবুর করো, আরো কিছু ব'লে যাই,
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই ।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না !

বীথিকা

বৎসরে বৎসরে শোক-করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিৎ ভাঙে স্মৃতিটার ।
ভিড় ক'রে ঘটা করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
কবি 'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের ।
“ভুলিব না ভুলিব না” এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনে কভু, বলো তাহে হিত কার !
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে ।
শুষ্ক উৎস খুঁজে' মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশলাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো,
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সত্বপায় এ নহে ।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ,
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য

বীথিকা

সকলি আভূতি-রূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিংকে না যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে ।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে ॥

নাহোর

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প ।
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত,
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত ।
তাই ছেড়ে দিতে হোলো শেষটা
কলমের ব্যবহার চেষ্টা ।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গত জন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত ।
নাই তার সঞ্চয়-তৃষ্ণা
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা ।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই ।

বীথিকা

ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে ।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জ
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে ।
মোচাক রচে না কী জন্মে,
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্তে
গাল দিক্ খেদ নাই তা নিয়ে ;
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে ;
জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে ;—
কিস্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির ।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব,
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত ।
যাহা-কিছু হয় নাই পক্ষ,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,

বীথিকা

যা রয়েছে আভাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে “অস্ত” ।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য ।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে ।
যে-রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে ?
বসে আছি, প্রলয়ের পথকার
কবে করিবেন তার সংকার,
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে ?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক্,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক্ ।—
আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক্ অন্তিম হর্ষ ।
বোবা তরু-লতিকার বাক্য
দিক্ তারে অসীমের সাক্ষ্য ।

অভ্যাগত

(গান)

মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম

অন্তবিহীন পথ

আসিতে তোমার দ্বারে,

মরুতীর হতে স্খাশ্চামলিম পারে ।

পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি

সিক্ত যুথীর মালা

সকরণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা,

লজ্জা দিয়ো না তা'রে ॥

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে

বনে বনে,

পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা

সমীরণে ।

বীথিকা

দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়ন-তলে
নিভূতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখী
ঝড়ের অন্ধকারে ॥

২২ শ্রাবণ, ১৩৪২

শাস্তিনিকেতন

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে । আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাক্কণের 'পর,
তখন সে সন্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তা'রে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন ।

বীথিকা

দ্যুলোকে ভুলোকে মিলে' শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁথির কোণায়,
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে স্বে
লাগে স্বেধা, লাগে স্বেধ,
তার মাঝে সে রহস্য স্বেধুর
অনুভব করি
যাহা স্বেগভীর আছে ভরি'
কচি ধানক্ষেতে ;
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম স্বেধে ;
আমলকি পল্লবের পেলব উল্লাসে ;
মঞ্জরিত কাশে ;
অপরাহ্ন কাল,
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্মী তরী গতির বিদ্যতে,
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে ;

বীথিকা

চটুল দোয়েল পাখী সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে ।

হে প্রেয়সী এ জীবনে

তোমারে হেরিয়াছিনু যে-নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয় ।
আঁখিতারা স্নহের পরশমণির মায়া ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা ।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে ল'য়ে আলে। আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে ;

বীথিকা

সেই উপহারে

পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর ।

আমার অন্তর

রচিয়াছে নিভৃত কুলায়,

স্বর্গের সোহাগে ধন্য পবিত্র ধূলায় ॥

২৫ আগষ্ট, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

যুক্তি

জয় করেছিঁনু মন, তাহা বুঝি নাই,

চলে গেলু তাই

নতশিরে ।

মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ডাকিবে সে ফিরে ।

মানিল না হার,

আমারে করিল অস্বীকার ।

বাহিরে রহিনু খাড়া

কিছুকাল, না পেলেম সাড়া ।

তোরণ-দ্বারের কাছে

টাঁপা গাছে

দক্ষিণ বাতাসে থরথরি

অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি' ।

দাঁড়ালেম পথপাশে,

উর্দ্ধে বাতায়নপানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে ।

দেখিনু নিবানো বাতি ;

আত্মগুপ্ত অহঙ্কৃত রাতি

কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রুকুটি ।

বীথিকা

এ কথা ভাবিনি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি'
হয়তো সে করিতেছে খান খান
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান ।
দূর হতে দূরে গেনু স'রে
প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধ'রে ।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচি ধানক্ষেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে ছলিয়াছে উষার অলক ।
সহসা উঠিল বলি' হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে ।

বাথিকা

কামনার যে-পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন,
নিষ্ঠুর আঘাতে, তার
ভেঙে গেছে দ্বার,
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে,
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে ।
আপনারে শীর্ণ করি'
দিবস শৰ্বরী
ছিনু জাগি'
মুষ্টিভিক্ষা লাগি' ।

উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখীর গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে ।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি'
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি' ॥

২০ ভাদ্র, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,

যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা

হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে

দক্ষিণ পবনে ।

বুঝি মনে হোলো, যেন চারিধার

সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার ।

মনে হোলো, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়

এ তোমার নয় ।

ঘনপুঞ্জ অশোক-মঞ্জরী

বাতাসের আন্দোলনে বারি' বারি'

প্রহরে প্রহরে

যে নৃত্যের তরে

বিছাইছে আস্তুরণ বনবীথিময়

সে তোমার নয় ।

বীথিকা

ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,

এই মাধুর্যের দান,

যুগে যুগান্তরে

শুধু মধুরের তরে

কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,

সে তোমার নয় ।

অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া

অকিঞ্চন-হিয়া

চলিয়াছ দিনরাতি,

নাই সাথী,

পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,

শুধু কানে

চারিদিক হতে সবে কয়—

এ তোমার নয় ॥

তবু মনে রেখো, হে পথিক,

দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক

আছে ভবে ।

বীথিকা

দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে ।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি' ;
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা, নিষ্ঠুর বিরহ ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই,
সেথা পায় ঠাই
পান্থ মেঘদল ;

ল'য়ে রবিরশ্মি, ল'য়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অন্তমুদ্রের পারে ভেসে তা'রা যায় অন্তমনা ।
চেয়ে দেখো, দৌঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে,
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে,

বীথিকা

কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,

খাঁচার মতন

রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা,

তা'রাও ওদের কাছে হারাল অপূর্ব অসীমতা ।

দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,

তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি' ॥

মূল্য

আমি এ পথের ধারে

একা রই,

যেতে যেতে যাহা কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে

মূল্য তার হোক না যতই

তাহে মোর দেনা

পরিশোধ কখনো হবে না ।

দেবো ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,

চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,

যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে

অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে

কেহ নাহি জানে,—

আগন্তুক, অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে

ভরিল তোমার হাত অন্তমনে পথে যাতায়াতে ।

বীথিকা

প'ড়ে ছিল গাছের তলাতে

দৈবাৎ বাতাসে ফল

ক্ষুধার সম্বল ।

অযাচিত সে স্বেযোগে খুসি হয়ে একটুকু হেসো,

তার বেশি দিতে যদি এসো

তবে জেনো মূল্য নেই

মূল্য তার সেই ।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও,

তাহারে কোরো না হয়

দান স্বীকারের ছলে

দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে ॥

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে

মুকুলে পল্লবে

উদ্ধারিত আনন্দের আমন্ত্রণ

গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি' ফাল্গুনের পবন গগন,

সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়

কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায়,

চটুল চরণ কারো তূণে তূণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া

নির্দয় দলন-চিহ্ন গিয়েছে অঁকিয়া

অসঙ্কেচ নূপুর-বাঙ্কারে ;

কটাক্ষের খরধারে

উচ্চহাস্য করেছে শাণিত ।

কেহ বা করেছে স্নান অমানিত

অকারণ সংশয়েতে আপনারে

অবগুণ্ঠনের অঙ্ককারে ।

বীথিকা

কেহ তা'রা নিয়েছিল তুলি'
গোপনে ছায়ায় ফিরি' তরুতলে বারা ফুলগুলি,
কেহ ছিন্ন করি'
তুলেছিল মাধবী-মঞ্জরী,
কিছু তা'র পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে
কিছু তা'র বেণীতে জড়ায়ে,
অন্য মনে গেছে চলে গুন গুন গানে ।

আজি এ ঋতুর অবসানে

ছায়াঘন-বীথি মোর নিস্তরু নির্জন,
মৌমাছির মধু-আহরণ
হোলো সারা,
সমীরণ গন্ধহারা
তৃণে তৃণে ফেলিছে নিঃশ্বাস ।
পাতার আড়াল ভরি' একে একে পেতেছে প্রকাশ
অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,
শাখা অবনত ।

বোধিকা

নিয়ে সাজি

কোথা তা'রা গেল আজি,

গোধূলি-ছায়াতে হোলো লীন

যারা এসেছিল একদিন

কলরবে কান্না ও হাসিতে

দিতে আর নিতে ।

আজি ল'য়ে মোর দানভার

ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার ;

অপ্রগল্ভ গৃঢ় সার্থকতা

নাহি জানে কথা ।

নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিঃশব্দ ভুবনে

আপনার মনে

আপনার তারাগুলি

কোন বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি,'

নাহি জানে আপনি সে,—

স্বদূর প্রভাত পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে ।

১৯ ভাদ্র, ১৩৪২

শাস্তিনিকেতন

নমস্কার

প্রভু,

সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে

মমত্ব নাই তবু,

ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা ।

তব নিবারণ-ধারা

যে বারতা বহি' সাগরের পানে

চলেছে আত্মহারা

প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা ।

দৌহার এ দুই বাণী

'ওগো উদাসীন, আপনার মনে

সমান নিতেছ মানি,'

সকল বিরোধ তাই তো তোমায়

চরমে হারায় বাণী ।

বীথিকা

বর্তমানের ছবি

দেখি যবে, দেখি নাচে তার বুকে

ভৈরব ভৈরবী,

তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জানো

নিত্যকালের কবি—

কোন কালিমার সমুদ্রে কূলে

উদয়াচলের রবি ।

যুঝিছে মন্দ ভালো ।

তোমার অসীম দৃষ্টি-ক্ষেত্রে

কালো সে রয় না কালো ।

অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে

ছদ্মবেশের আলো ॥

দুঃখ লজ্জা ভয়

ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা

মানব-বিশ্বময়,

বীথিকা

সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়,—
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয় ॥

তপ্ত পাত্র ভরি'
প্রসাদ তোমার রুদ্ধ জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি',
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিষ্ তাহা পান করি' ।

নিষ্ঠুর পীড়নে যাঁর
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে
মথিছে অন্ধকার
তুলিছে আলোড়ি' অমৃত জ্যোতি
তাঁহারে নমস্কার ॥

৩ আগষ্ট, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নিশ্চলতম নীল,
উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরণ আলো ;
সবুজে সোনায়ে ভুলোকে ছ্যলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো ।
ঘাসে ঝরে-পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে ।
মালতী-বিতানে শালিকের কলরবে
কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে ।
এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপ-কথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিত কী জানি কী উদ্দেশে
এপারের চির-পরিচিত ঘর ফেলে ।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ পানে ।

বীথিকা

তেপান্তরের সূদূর আলোক-ছায়া

ছড়িয়ে পড়িল ঘর-ছাড়া মোর প্রাণে ।

মন বলে, “ওগো অজানা বন্ধু, তব

সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি ।

ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব

চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি’ ।

দিন গেছে মোর বৃথা বয়ে গেছে রাতি,

বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া ;

খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথী,

বকুল-গন্ধে দিয়েছিল বৃষ্টি সাড়া ।

আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিত সম

নেমে আসে বাণী করুণ কিরণ-ঢালা,

চির জীবনের হারানো বন্ধু মম

এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা ।”

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল !

অশোক তরুতল

অতিথি লাগি' রাখেনি আয়োজন ।

হায় সে নির্জন

শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি'

কাণ্ডাল সম মেলেছে অঙ্গুলি ;

স্বর-সভার অঙ্গরার চরণঘাত মাগি'

রয়েছে বৃথা জাগি' ॥

আরেকদিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে

যৌবনের তুফান দিল তুলে' ।

দখিন বায়ে তরুণ ফাল্গুনে

শ্যামল বন-বল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে

পল্লবের আসন দিল পাতি' ;

মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি ॥

বীথিকা

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু রোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো ।

ব্যাকুল তার নীরব আবেদনে
যেদিন গেছে সেদিনখানি জাগায়ে তোলো মনে ।

যে দান মৃদু হেসে

কিশোর-করে নিয়েছ তুলি' পরেছ কালোকেশে
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা আগে
প্রভাতবেলা নবীনাকরণ রাগে ।

সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি' কথা

ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা ॥

২৭ ভাদ্র, ১৩৪২

শাস্তিনিকেতন

দেবতা

দেবতা মানব-লোকে ধরা দিতে চায়

মানবের অনিত্য লীলায় ।

মাঝে মাঝে দেখি তাই

আমি যেন নাই,

ঝঙ্কত বীণার তন্তুসম দেহখানা

হয় যেন অদৃশ্য অজানা ;

আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়

সঙ্গীতে হারায়ে যায় ;

নিবিড় আনন্দ-রূপে

পল্লবের স্তূপে

আমলকী-বীথিকার গাছে গাছে

ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে ।

প্রেয়সীর প্রেমে

প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে

দৃষ্টি হতে শ্রুতি হতে ;

বীথিকা

স্বর্গস্থধাত্ৰোতে

ধৌত হয় নিখিল গগন,

যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন ।

মৰ্ত্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি

পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি' ।

দেব-সেনাপতি

নিযে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি

যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল ;

ত্যাগের বিপুল বল

কোথা হতে বক্ষে আসে ;

অনায়াসে

দাঁড়াই উপেক্ষা করি' প্রচণ্ড অন্যায়ে,

অকুণ্ঠিত সৰ্বস্বের ব্যয়ে ।

তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে,

দেবতা বাহিরি' আসে অমৃত আলোতে,

তখন তাহার পরিচয়

মৰ্ত্ত্যালোকে অমৰ্ত্ত্যেরে করি' তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয় ॥

২৬ শ্রাবণ, ১৩৪২

শাস্তিনিকেতন

শেষ

বহি' ল'য়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি ল'য়ে, গ্লানি ল'য়ে, ল'য়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
ল'য়ে প্রীতি
ল'য়ে সুখ-স্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে ।
সেই রিক্ত অবকাশ যে-আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উদ্ভাসে
নির্মল পরশ তা'র
খুলি' দিল গত রজনীর দ্বার ।

বীথিকা

নব জীবনের রেখা
আলোকরূপে প্রথম দিতেছে দেখা ;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার ; ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিম তারাসম
এ চৈতন্য মম ।

ক্ষোভ তার নাই দুঃখে স্মখে,
যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে ।
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তরক নির্বাক
ভবিষ্যৎ জ্যোতিষ্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য্য অস্তগামী ।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—“আমি ॥”

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

শান্তিনিকেতন

জাগরণ

দেহে মনে সৃষ্টি যবে করে ভর

সহসা চৈতন্যলোকে আনে কল্পান্তর,

জাগ্রত জগৎ চলে যায়

মিথ্যার কোঠায় ।

তখন নিদ্রার শূন্য ভরি’

স্বপ্ন সৃষ্টি শুরু হয়, প্রব সত্য তারে মনে করি ।

সেও ভেঙে যায় যবে

পুনর্বার জেগে উঠি অন্য এক ভবে ;

তখন তাহারে সত্য বলি

নিশ্চিত স্বপ্নের রূপ অনিশ্চিত কোথা যায় চলি’ ।

তাই ভাবি মনে

যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,

মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে

আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে’,

সব-কিছু অন্য এক অর্থে দেখি,—

চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি’ তারে জানিবে কি ?

সহসা কি উদিবে স্মরণে

ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ॥

২৯ ভাদ্র, ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

